রাজশাহী জেলা সৃষ্টি ও শহর

গোড়াপত্তনের ইতিবৃত্ত

জিলা ও মহকুমা এই শব্দ দুটি সরাসরি আরবী ভাষা থেকে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে। আরবী ভাষায় 'জ' এর স্থলে 'দ' ব্যবহৃত হয়। সেক্ষেত্রে উচ্চারণ হবে দিলা (Dila)। ফারসি ভাষায় উচ্চারণ জিলা (Zila)। আভিধানিক অর্থে বিস্তীর্ণ ভূখন্ড(Tract of Land) বুঝায়। আরবীতে জেলা বলতে নির্দি ষ্ট এলাকা বুঝানো হয় যেটি শুধুমাত্র বিচারকগণের অধিক্ষেত্র। রাজস্ব আদায় কিংবা সাধারণ প্রশাসনিক অধিক্ষেত্র নয়। তদ্রূপ আরবী ভাষায় মহকুমা (Mahkama) বলতেও বিচারকগণের আদালত (Tribunal/Court of Justice) এর অধিক্ষেত্র বুঝানো হয়েছে।

লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস[১] (১৭৩২-১৮১৮) বাংলার গর্ভণর হিসেবে নিয়োগ পান ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে। ১৭৭৩ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাশ হবার পর পদাধিকার বলে তিনি বৃটিশ ভারতের গভর্ণ র জেনারেল পদ লাভ করেন। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য তিনি ইংল্যান্ডের ডিস্ট্রিকট এর অনুকরণে বাংলা প্রদেশকে কতগুলি জেলায় বিভক্ত করলেন। এরপূর্বে ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের ১২ আগস্ট লর্ড ক্লাইভ মোগল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে বার্ষি ক২৬ লক্ষ টাকা রাজস্ব প্রদানের বিনিময়ে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানী লাভ করেন। ইংরেজরা রাজস্ব আদায়ের ভার নিজেদের হাতে রাখে। মোগল সম্রাট কর্ত্তৃক নিয়োজিত মুর্শি দাবাদের নবাবের হাতে ছিল শাসন ও বিচার ব্যবস্থা। এভাবেই বরার্ট ক্লাইভের প্রবর্তি ত দ্বৈত শাসন বাংলায় চালু হল। মানুষ অচিরেই এর কুফল পেতে শুরচ করলো। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের প্রজাদের উপর রাজস্বের অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে দিল। বেশ কয়েক বছর আগে থেকেই দেশে একাধিক ছোট বড় যুদ্ধ বিগ্রহ (পলাশীর যুদ্ধ, বক্সারের যুদ্ধ ইত্যাদি) ঘটে গেছে। এর ফলে নানা ধরনের সামাজিক বিশৃংখলাসহ এদেশের আইন শৃংখলার চরম অবনতি ঘটতে থাকে। কৃষকরা স্বাভাবিকভাবে ফসলাদি উৎপন্ন করতে পারলো না। ইংরেজ কোম্পানির অত্যাচারে কয়েকবছরের মধ্যেই বাংলার অধিকাংশ কৃষক নিঃস্ব ও হতদরিদ্রের পর্য ায়ে পৌঁছে গেলো। সমসাময়িককালে প্রাকৃতিক দুর্যে াগ অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বৈরী আচরণের সাথে যোগ হলো দস্যু তস্করের ব্যাপক উৎপাত। এতে সমগ্র বঙ্গাদেশ অন্ধকারে নিমজ্জিত হলো। ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে দেখা দিলো ভয়ংকর দুর্ভি ক্ষ- যেটি ছিয়াত্তরের (বাংলা ১১৭৬) মন্বন্তর[২] নামে পরিচিত। এই দুর্ভি ক্ষে সমগ্র বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এক তৃতীয়াংশ কৃষি জমি জঙ্গালে পরিণত হয়। রাজশাহী অঞ্চলেও এই দুর্ভি ক্ষের থাবায় অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশের রাজস্ব আদায়ের অধিকার অর্জনের পর কী হারে সাধারণ মানুষের কাছ

থেকে ভূমি রাজস্ব আদায় করতো এর প্রমাণ রয়েছে তাদেরই লিখিত দলিলে। এল.এস.এস ও'ম্যালি[৩] ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীর কালেক্টর ছিলেন। তাঁর সম্পাদিত 'বেঙ্গল ডিস্ট্রিকট গেজেটিয়ার রাজশাহী' নামক গ্রন্থের ৪০ পৃষ্ঠায় রয়েছে গুরচত্বপূর্ণ একটি তথ্য।১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ১৭৭০ পর্য ন্ত রাজশাহী জেলায় রাজস্ব আদায় হয়েছিল ২৭ লক্ষ টাকা। পরবর্তী সময়ে দুর্ভি ক্ষের কারণে রাজস্ব আদায় দারচণভাবে হ্রাস পায়। তথ্যটি এরূপ- "The collection of revenue, it may be added, had previously come to a much higher figure, viz. 27 lakhs from 1766 to 1770. The decrease in subsequent years was attributed in part to the general calamity of the famine in 1769 and 1770".

এমনি এক সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাংলার গভর্ণ র হিসেবে নিয়োগ দিলো।১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে নিয়োগ পাবার পর প্রথমেই তিনি দিউয়ানী সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য ক্রম(দপ্তরসহ) মুর্শি দাবাদ থেকে সরিয়ে কলকাতায় স্থানান্তর করলেন (১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে)। তিনি ছিলেন একজন সুচতুর শাসক। ক্লাইভের দ্বৈত শাসনের পরিবর্তে তিনি চাইলেন কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে একক শাসনব্যবস্থা। প্রথমেই রাজস্ব আদায়ের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। এই উদ্দেশ্যে এদেশে ইংল্যান্ডের জেলাগুলির আদলে জেলা গঠন করে রাজস্ব আদায়ের জন্য জেলায় জেলায় কালেক্টর[৪] নিয়োগ দিলেন। এই সময়ে রাজশাহী বলতে বুঝাতো নাটোরের রাজা কর্তৃ ৃর্ক মুর্শি দাবাদের নবাবগণের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিশাল জমিদারী। এটি 'রাজশাহী জমিদারী' নামে পরিচিত। নবাব মুর্শি দকুলী খান কর্তৃ ৃর্ক প্রবর্তি ত বাংলার২৫টি জমিদারীর (ইহতিমামবন্দি) অন্যতম ছিল রাজশাহী জমিদারী। ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার দিউয়ানী লাভের পরেও রাজশাহী জমিদারীর আয়তনকে রাজশাহী জেলার আয়তন হিসেবেই গণ্য করা হতো। ওয়ারেন হেস্টিংস রাজশাহী জমিদারী সম্পর্কে ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে একটি রিপোর্ট লিখেছিলেন যেটি ঐতিহাসিকভাবে অত্যন্ত গুরচত্বপূর্ণ । তিনি বলছেন "The zamindari of Rajshahi, the second in rank in Bengal and yielding an annual revenue of about twenty five lakhs of rupees. The extent of the estate, will be realized from the fact that it had an area of nearly 13.000 (12,909) square miles and included not only a great part of north Bengal, but also a large portion of the present murshidabad Nadia, Jessore, Birbhum and even Burdhwan. Holwell stated that, it extended over "35 days travel."

অর্থাৎ ওয়ারেন হেস্টিংস প্রদত্ত১৭৮৬ সালের রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে রাজশাহীর আয়তন ছিল১২.৯০৯ বর্গ মাইল এবং বার্ষিক রাজস্ব আদায় হতো২৫ লক্ষ টাকা। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সে সময়কার আরেকজন বড় কর্তা গ্রান্ট সাহেব। ইনি বাংলার বিশেষ করে বিশাল রাজশাহী জেলার অর্থনৈতিক অবস্থার বর্ণনা দিয়ে গেছেন। ইতিহাসে এটি "Analysis of the Finances of Bengal" নামে পরিচিত। তার প্রদত্ত অর্থনৈতিক বিশেলষণে রাজশাহী সম্পর্কে বলা হয়েছে এভাবে, "The most unwieldy extensive zamindari of Bengal or perhaps in India, It produced at least four-fifths of all the silk, raw or manufactured, used in or exported from the effeminated luxurious Empire of Hindustan".

১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার দিউয়ানী বিভাগ(রাজস্ব) মুর্শিদাবাদের নবাব কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হতো। নবাবের প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা রেজা খান ছিল্মে দিওয়ানী বিভাগের প্রধান। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দে গভর্ণরের দায়িত্ব পেয়ে রেজা খানের নিকট থেকে রাজস্ব বিভাগের সকল প্রকার দায়িত্ব হস্তান্তর করে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে আনলেন। এর পূর্বে কোম্পানি বাংলার বড় বড় জেলাগুলোতে (ঢাকা, চট্টগ্রাম, যশোর, রাজশাহী, দিনাজপুর ইত্যাদি) ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দ থেকে একজন করে রাজস্ব কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছিলেন। এদের বলা হত(পদবী) সুপারভাইজার। রাজশাহী জেলার (সদর নাটোর) প্রথম সুপারভাইজার হিসেবে বাউটন রউজ (Boughton Rouse) নামে একজন ইংরেজ এসে নাটোরে পদার্পণ করলেন ১৯ ডিসেম্বর ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে। তিনি নাটোর শহরের কানাইখালী মৌজায় নারদ নদের তীরে একটি চালাঘর ভাড়া করে সেখানে দাপ্তরিক কাজ শুরচ করেন। এভাবে সুপারভাইজার পদটি চালু ছিল ১৭৭২ পর্যন্ত। ওয়ারেন হেস্টিংস একই বছরে গভর্ণরের দায়িত্ব পাবার পর সুপারভাইজার পদটির বিলুপ্তি ঘটিয়ে রাজস্ব আদায়ের কর্মকর্তার নাম দিলেন কালেক্টর। ১৭৭২ থেকে ১৭৭৪ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত কালেক্টর নামক পদটি বহাল ছিল।১৭৭৪ থেকে ১৭৮৬ সাল পর্যন্ত এসে পদটির বিলুপ্তি ঘটে। ১৭৮৬ সালের এপ্রিল মাস থেকে পুনরায় নতুন করে কালেক্টর পদের সৃষ্টি হলো প্রশাসন পরিচালনার উদ্দেশ্যে। হেস্টিংস ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ এবং সুচতুর শাসক। তিনি কোম্পানির কর্তৃৃর্ত্ব শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকুক সেটি চাইলেন না। ক্রমান্বয়ে বিচারিক কতৃৃর্ত্বসহ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ কোম্পানির হাতে চলে আসার যাবতীয় কৌশল তিনি প্রয়োগ করতে থাকেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি ব্যয়ে কলকাতায় একটি মাদ্রাসা স্থাপন করলেন। সেকালে সরকারি দপ্তরের ভাষা ছিল ফারসী। এদেশের মানুষেরা যেন ভালভাবে ফারসী ভাষা শিক্ষা লাভ করে কোম্পানির অফিসের কাজ সুচারচরূপে পরিচালনা করতে পারেন সেজন্যেই এই ব্যবস্থা।

হেস্টিংস ফারসী, উর্দূ ও বাংলা ভাষা ভালভাবে রপ্ত করেছিলেন। উচ্চ শিক্ষিত মুসলমান এই মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেলেন। তবে মাদ্রাসার সর্ব ময় কতৃর্ত্বে ছিলেন একজন ইংরেজ অফিসার। এভাবে ওয়ারেন হেস্টিংস যশোর জেলার মুড়লীতে ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটি আদালত প্রতিষ্ঠা[৫] করলেন। যদিও সে সময়ে বিচারিক কাজগুলি পরিচালিত হতো মুর্শিদাবাদের নবাব কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত নায়েব নাজিম নামক উচ্চপদস্থ একজন কর্ম কর্তার(ডেপুটি গভর্ণর) মাধ্যমে। বড় বড় জেলায় নায়েব নাজিম কতৃর্ক নিয়োগকৃত দারোগা পদবিধারী অফিসারগণ শাসন কাজসহ বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। দারোগাগণ খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি ইত্যাদি বড় ধরনের অপরাধের বিচার করতেন। এরা ফাঁসির আদেশ প্রদানের ক্ষমতা রাখতেন। জেলখানার নিয়ন্ত্রণ এদের হাতেই ছিল। ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানি কর্তৃক মুড়লীতে (যশোর) প্রথম আদালত সৃষ্টি হল এবং সেখানে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে প্রথম নিয়োগ পেলেন টিলম্যান হেঙ্কল নামক একজন সুদক্ষ ইংরেজ। তিনি একাধারে জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়ে ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি মুড়লীতে এলেন। এ সময়ে তার অধিক্ষেত্র ছিল যশোর (খুলনা ও বাগেরহাট সে সময়ে যশোর জেলার সাথে সংযুক্ত ছিল), ফরিদপুর, চবিবশ পরগনা জেলার ইছামতি নদীর পূর্ব াংশ(বর্তমান সাতক্ষীরা জেলা)। কোম্পানি নিয়ন্ত্রিত আদালতের জজ ম্যাজিস্ট্রেটগন সে সময়ে বড় ধরনের অপরাধের বিচার করতে পারতেন না। সাধারণ চুরিসহ দাঙ্গা হাঙ্গামা জাতীয় অপরাধের বিচার করতেন। এই অবস্থা চলতে থাকে ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দ পর্য ন্ত।

রাজশাহীতে কোম্পানি কর্তৃর্ক আদালত প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দে। ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের একজন অফিসার মিস্টার জন এভলীন (Mr. John Evelyn) মুর্শিদাবাদের শহরতলী মুরাদবাগ নামক স্থানে কোম্পানির দপ্তরে অবস্থান করে রাজশাহী জেলার জরিপ কাজ করছিলেন। এর কয়েকমাস পরেই অর্থ াৎ১৭৮৩ খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসে মিস্টার জর্জ ডাললাস (Mr. George Dallas) রাজশাহীর প্রথম কালেকটর হিসেবে নিয়োগ পেয়ে রাজশাহী জেলার সদর দপ্তর নাটোরে এসে কাজে যোগদান করলেন। নাটোরের নারোদ নদ তীরবর্তী কানাইখালীতে ছিল কালেক্টরের দপ্তর। তখন অবধি কালেকটরী ভবন নির্মি ত হয়নি। আদালত ছিল নাটোর রাজবাড়ীর মধ্যে। সেখানেই ছিল জেলখানা। মিস্টার জর্জ ডাললাস রাজশাহী জেলার কালেক্টর হিসেবে কাজ শুরচ করেন। জানুয়ারী ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে মিস্টার পিটার স্পীক (MR Peter Speke) জর্জ ডাললাসের নিকট থেকে জেলার কালেকটরের দায়িত্ব বুঝে নিলেন। পরের বছর (১৭৮৭) মি: পিটার স্পীক একাধারে রাজশাহী জেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট এবং কালেকটরের দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। তাঁর ছিল দুইজন সহকারী মিস্টার মাইকেল অ্যাটকিনসন (Mr. Michael Atkinson)

এবং মিস্টার হকিন্স (Mr. Hawkins)। ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে যশোর থেকে বদলী সূত্রে রাজশাহীতে (নাটোর) এসে মিস্টার পিটার স্পীকের নিকট থেকে জেলার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন টিলম্যান হেঙ্কেল। টিলম্যান হেঙ্কেল ছিলেন একজন যোগ্য প্রশাসক। কোম্পানি শাসনামলের প্রথম জজ ও ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তিনি। তাঁর পরিকল্পনা ও প্রস্তাব অনুসারে ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে এদেশে (যশোরে) প্রথম কালেকটরেট স্থাপিত হয়। জেলা প্রশাসনের নিয়ম কানুন প্রবর্তনসহ এর ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির পথিকৃৎ তিনি। তাঁর প্রস্তাবনায় এবং পরিকল্পনায় এদেশে প্রথম মহকুমা গঠনের ধারণা পেয়েছিলেন কোম্পানি সরকার। তিনি একাধারে যশোরের জজ, ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেকটর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সুন্দরবনের ব্যাপক এলাকা পরিষ্কার করে জনবসতি গড়ে তোলেন। সুন্দরবনের পূর্ব থেকে পশ্চিমে মোট তিনটি বৃহৎ নদীবন্দর গড়ে তোলেন। এগুলি হল, পূর্ব দিকে বলেশ্বর নদের তীরবর্তী কচুয়া (বাগেরহাট জেলা), মাঝখানে কপোতাক্ষ নদের তীরে চাঁদখালী (খুলনা জেলা) এবং পশ্চিমে যমুনা ও কালিন্দী নদীর সঙ্গামস্থলে হিঙ্গলগঞ্জ (হেঙ্কেল সাহেবের নামানুসারে)। হিঙ্গালগঞ্জ দক্ষিণ চবিবশ পরগনা জেলায় (ভারত) অবস্থিত। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে যশোর জেলার কালেকটর হিসেবে দায়িত্ব পাবার পর তার সহকারী মিস্টার ফস্টারকে চাঁদখালীতে প্রেরণ করে কিছু বিচারিক ক্ষমতাসহ প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রদান করেন। সমগ্র বাংলার প্রথম মহকুমা গঠনের জন্য চাঁদখালী বন্দরকে নির্ব াচিত করা হয়। এ উদ্দেশ্যে সেখানে কিছু স্থাপনা নির্মি ত হল। চাঁদখালিতে বিচারকার্য সহ রাজস্ব আদায়ের কাজ শুরচ হল। শেষ পর্য ন্ত চাঁদখালীকে মহকুমা সদর দপ্তর হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়নি ফস্টার সাহেবের শারীরিক অসুস্থতার কারণে। তবে হেঙ্কেলের উদ্যোগ বৃথা যায়নি। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে খুলনার নয়াবাদ থানাকে (বর্তমান খুলনা শহর) বাংলার প্রথম মহকুমা গঠনের মধ্য দিয়ে হেঙ্কলের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিল। হেঙ্কেল এদেশের প্রথম কালেক্টর হিসেবে নিয়োগ পাবার পর আরও কয়েকটি যুগান্তকারী কাজ করে গেছেন। সে সময়ে পুলিশ ফোর্স সংশিলষ্ট মোগল ফৌজদারগণের অধীনে কাজ করতেন। যশোর জেলা ছিল বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে। অল্প সংখ্যক পুলিশ ফোর্স নিয়ে বিশাল এলাকার আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্রণে রাখা ছিল অসম্ভব। টিলম্যান হেঙ্কেল পুলিশ ফোর্স কে যুগোপযোগী করলেন। সে আমলে বৃহত্তর যশোর জেলায় ছিল মাত্র ৪টি থানা। এগুলো হলো- ভূষণা (মাগুরা অঞ্চল), মির্জানগর (কেশবপুর, যশোর), নয়াবাদ (খুলনা) এবং ধরমপুর (পাংশা)। থানাগুলোর অধীনে ছিল বেশ কয়েকটি ফাঁড়ি। চুরি ডাকাতি প্রতিরোধের জন্য হেঙ্কেল এলাকার জমিদার ও তালুকদারগণের উপর দায়িত্ব অর্প ণ করেছিলেন। চুরি ডাকাতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবার ফলে জমিদারগণের উদ্যোগে যশোর জেলায় ৪টির স্থলে ১৩টি থানা স্থাপিত হয়েছিল।

টিলম্যান হেঙ্কেল রাজশাহী জেলার জজ-ম্যাজিস্ট্রেট ও কালেক্টর হিসেবে ১৭৮৯ খ্রিষ্টাব্দে দায়িত্ব নেওয়ার পর গতানুগতিক কাজ করে গেছেন। যশোরে তিনি যে উদ্যম ও মেধা প্রয়োগ করে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করে গেছেন রাজশাহীতে তেমন নতুন কোন কিছুই তার মাধ্যমে পাওয়া গেল না। রাজশাহীতে দায়িত্বপালন করাকালীন তার সময়ে এদেশে লর্ড কর্ণ ওয়ালিস[৬] প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত[৭] প্রথা চালু হয়েছিল।

১৭৭২ থেকে ১৭৮৫ খ্রিষ্টাব্দের ১ ফেব্রচয়ারি পর্য ন্ত প্রায় তের বছর গভর্ণ র জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করার পর ওয়ারেন হেস্টিংস অবসর গ্রহণ করেন (কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হবার কারণে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন)। অস্থায়ীভাবে স্যার জন ম্যাকফারসন গভর্ণ র জেনারেল পদে নিযুক্ত হলেন। এরপর ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে লর্ড কর্ণ ওয়ালিস বৃটিশ ভারতের গভর্ণ র জেনারেল পদে নিযুক্তি পেয়ে ভারতে পদার্প ণ করলেন। ভারতে আসার পূর্বে তিনি বৃটিশদের পক্ষে একজন সেনাধ্যক্ষ হিসেবে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ দমনের জন্য নিয়োজিত ছিলেন। প্রথম কয়েক বছর মহীশুরের সুলতান ফতেহ আলী টিপুর বিরচদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন (তৃতীয় মহীশুর যুদ্ধ ১৭৮৯ থেকে ১৭৯২ পর্য ন্ত)। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে স্থায়ীভাবে কলকাতায় অবস্থান করে বাংলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করলেন। ২২ মার্চ ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রথা বলবৎ হল। কর্ণ ওয়ালিস বঙ্গাদেশকে মোট২৩টি জেলায় বিভক্ত করে প্রতিটি জেলায় একজন কালেক্টর নিয়োগ করেন। তাকে ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রদান করা হল। প্রতিটি জেলায় একজন করে জজ নিয়োগ দেয়া হল। এই সময় থেকেই নবাব নিয়ন্ত্রিত নায়েব নাজিম ও দারোগাগণ কর্ত্তৃক ফৌজদারী বিচার ও তদন্ত ক্ষমতা রহিত করার প্রক্রিয়া শুরচ হল। সম্পূর্ণ রূপে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে চলে আসতে শুরচ করে জেলা প্রশাসনসহ বিচারিক ক্ষমতা। এভাবেই বর্তমানকালের জেলা প্রশাসন, জজসীপ ও থানা প্রশাসনের সূচনা হয়েছিল ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে থেকে। কর্ণ ওয়ালিস২৩ জেলার প্রত্যেকটিকে কয়েকটি থানা নিয়ে গঠন করলেন। থানায় নিয়োগ দেয়া হলো একজন করে দারোগা। নিজামত আদালত মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় সরিয়ে আনা হয়েছিল ১৭৯৩ সালে। জমিদারদের প্রজাপীড়ন বন্ধের জন্যে তাদের কাছ থেকে পুলিশী ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে থানা ও দারোগাদের রাখা হল।

লর্ড কর্ণ ওয়ালিস গভর্ণ র জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পূর্ব থেকেই বিশাল রাজশাহী জেলার শাসনভার পরিচালনা করা একজন কালেকটরের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদিও রাজশাহীর কালেক্টরের অধীনে দুইজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এদের একজন জেলার সদরদপ্তর নাটোরে অবস্থান করতেন। অপরজন জেলার পশ্চিমাঞ্চল মুর্শিদাবাদ শহরের শহরতলী মুরাদবাগে অবস্থান করতেন।

জেলার পুরাতন নথিপত্র দৃষ্টে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাজশাহী জেলায় আইন-শৃংখলার ব্যাপক অবনতি দেখা দিয়েছিল ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে। চোর-ডাকাত-দস্যু-তস্করদের দ্বারা সৃষ্ট তান্ডবে জেলার ব্যাপক জনগোষ্ঠী যারপর নাই ভোগান্তির মধ্যে দিন কাটাতেন। জেলার কালেকটর ম্যাজিস্ট্রেটের পক্ষে বিশাল এলাকায় কার্য করভাবে আইনের শাসন বলবৎ রাখা সম্ভবপর ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বিভক্ত করে নতুন জেলা গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই ফলশ্রচতিতে মার্চ ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী জেলা থেকে রোহনপুর ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ থানা দুইটি কর্তন করে নবগঠিত মালদহ জেলার সাথে সংযুক্ত করা হয়।[৮] উলিলখিত রাজশাহীর দুইটি থানার সাথে দিনাজপুর ও পুর্ণি য়া জেলা থেকে একাধিক থানা কর্তন করে মালদহ জেলার সাথে সংযুক্ত করা হয়।[৯] ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী জেলা থেকে আদমদীঘি, নওখিলা (বর্তমানকালের সারিয়াকান্দি), শেরপুর ও বগুড়া এই চারটি থানা বিচ্ছিন্ন করে বগুড়া জেলা গঠন করা হল।[১০] বগুড়া জেলার সাথে আরও সংযুক্ত করা হলো দিনাজপুর জেলা থেকে লালবাজার (বর্তমানকালের পাঁচবিবি থানা), ক্ষেতলাল ও বদলগাছি[১১] এবং রংপুর জেলা থেকে গোবিন্দগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ (বর্তমানে জামালপুর জেলাধীন) থানা দুইটি।[১২] ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন রাজশাহী জেলার আরেকটি থানা রায়গঞ্জ বগুড়ার সাথে সংযুক্ত হলো। বগুড়া জেলা হিসেবে আত্মপ্রকাশের পূর্বে এর অধিকাংশ এলাকা ছিল রাজশাহী জেলার ভাতুরিয়া পরগনা, ইদ্রাকপুর, জাহাঙ্গীরপুর সিলবর্ষ, বড় বাজু এবং তাহিরপুর জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত। এখানে উলেলখ্য যে রাজশাহী জমিদারী বা রাজশাহী জেলার আয়তন যখন সর্বোচ্চ ১২,৯০৯ বর্গ মাইল সে সময়ে এই জেলাটি সর্ব মোট ১৩৯টি পরগনার সমন্বয়ে বিস্তৃত ছিল। পরগনা সমূহের বিভাজন ছিল এরকম : রাজশাহী- ৬৮টি পরগনা, ভাতুরিয়া- ৩০টি পরগনা, ভূষণা- ২৯টি পরগনা এবং রাজমহল- ১২ পরগনা।[১৩]

১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে কর্ণ ওয়ালিশকৃত২৩টি জেলা গঠনের প্রাক্কালে প্রথমেই নিজ 'চাকলা' রাজশাহী নামে পরিচিত (পরবর্তী অংশে বিস্তারিতভাবে বর্ণ না করা হবে) গঙ্গা তীরবর্তী পশ্চিমে মুর্শি দাবাদ, নদীয়া ও যশোর জেলা সমূহের অংশ বিশেষসহ বীরভূম এবং বর্ধ মান সীমান্তে অবস্থিত বৃহত্তর রাজশাহীর অংশ বিচ্ছিন্ন করে পৃথক পৃথক জেলা গঠন করা হল। ইতোপূর্বে পরগনা লস্করপুর ও তাহিরপুর মুর্শি দাবাদ জেলার সাথে যুক্ত ছিল। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে এই দুইটি পরগনাকে মূল রাজশাহী জেলার সাথে সংযুক্ত করা হল। গঙ্গা অববাহিকার উলিলখিত জেলাসমূহের বিস্তীর্ণ এলাকা রাজশাহী থেকে বিচ্ছিন্ন করে পূর্ব দিকে ও উত্তর দিকে চলনবিল, ব্রহ্মপুত্র নদ এবং বিস্তীর্ণ বরেন্দ্রঅঞ্চল[১৪] নিয়ে রাজশাহী জেলার শাসনকার্য চলতে থাকে। নতুন এলাকাটিও আয়তনে ছিল বিশাল। অল্প কয়েক বছর শাসন

কাজ পরিচালিত হবার পরেও সম্ভবপর হল না সঠিকভাবে বিস্তীর্ণ রাজশাহীর এলাকা নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা। জেলার শাসন কাজ স্বাভাবিকভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার স্বার্থে প্রথমে মালদহ এরপর বগুড়া জেলার সৃষ্টি হলো যথাক্রমে ১৮১৩ ও ১৮২১ খ্রিষ্টাব্দে। নতুন জেলা গঠনের প্রক্রিয়া এখানেই থেমে থাকেনি। রাজশাহীর আয়তন আরও সংকুচিত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে গঠিত হলো নতুন জেলা পাবনা। রাজশাহী জেলা থেকে পাবনা, ক্ষেতুপাড়া (বর্তমান সাঁথিয়া-আতাইকুলা উপজেলা এলাকা), মথুরা (বর্তমান সময়ের বেড়া উপজেলা), শাহজাদপুর- এসকল থানাসমূহ বিচ্ছিন্ন করে জেলা পাবনার সাথে সংযুক্ত করা হল। ইতোপূর্বে ১৮৪০ খ্রিষ্টাব্দের ৯ জুন রাজশাহী জেলার রায়গঞ্জ থানাকে বিচ্ছিন্ন করে বগুড়া জেলার সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। এক্ষণে ১৮৭৫ খ্রিষ্টাব্দে ১৪ জানুয়ারি রায়গঞ্জ থানাকে বগুড়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাবনা জেলার সাথে জুড়ে দেওয়া হল। গঙ্গার (পদ্মা) দক্ষিণে যশোর জেলা থেকে ধরমপুর, মধুপুর, কুষ্টিয়া এবং কিছুদিন পর পাংশা- এই চারটি থানা যোগ হল পাবনার সাথে। পাবনা জেলা গঠিত হল গঙ্গার দুই পাড়ের থানা সমূহের সমন্বয়ে।[১৫] ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে কুমারখালী থানাকে সদরদপ্তর করে পাংশা, বালিয়াকান্দি ও কুমারখালীর সমন্বয়ে পাবনা জেলার অধীনে কুমারখালী মহকুমা গঠিত হল।[১৬] অবশ্য এর কয়েক বছর পরেই ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দে কুষ্টিয়া এবং ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে কুমারখালী থানা দুইটি পাবনা জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নদীয়া জেলার সাথে সংযুক্ত হল। ১৮৭১ খ্রিষ্টাব্দে পাংশা নবগঠিত ফরিদপুর জেলার (১৮৫৯ সালে) সাথে সংযুক্ত হল। কুমারখালী মহকুমা গঠনের (১৮৫৭) প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সিপাহী বিদ্রোহ এবং নীল বিদ্রোহ ঠেকানো।

পাবনা জেলা গঠনের পেছনে সে সময়কার সামাজিক অবস্থা ছিল প্রধান কারণ। বিশাল চলনবিল অঞ্চলসহ নদ-নদী অধ্যুষিত এলাকাগুলি ছিলো ডাকাত-দস্যুদের নিয়ন্ত্রণে। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হবার পর থেকে বাংলার বৃহৎ জমিদারীর উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে নতুন নতুন শতাধিক জমিদারের সৃষ্টি হতে থাকে। বাংলার বৃহৎ জমিদারীগুলির মধ্যে রাজশাহী, নদীয়া, বিষ্ণুপুর, কাশীজোড়া সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু হবার পরেও কয়েক বছর রাজশাহীর জমিদারের (নাটোর) হাতে এলাকার শান্তিরক্ষার দায়িত্ব অর্পিত ছিল। কিন্তু সেই ক্ষমতাও কেড়ে নেওয়া হল। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান অপরাধতৎপরতা বৃদ্ধিরোধে জমিদারগণের ভূমিকা মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। এরা চোর ডাকাতদের দমন করাতো দূরে থাক- এদের সাথে গোপনে সখ্যও গড়ে তুলেছিল- এমন প্রমাণ সে সময়কার কোম্পানি শাসকেরা পেয়েছেন। বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের পর ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য কোর্ট অব সার্কিট নামে মোট৪টি আদালত গঠন করেছিল। এগুলির অবস্থান ছিল

কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, পাটনা ও ঢাকায়। সে সময়ের কলকাতার তৃতীয় সার্কিট জজ মি: ই স্ট্রেচী (Mr. E. Strachey) মুর্শিদাবাদের নিজামত আদালতের রেজিস্ট্রার ডাবিলউ, বি. বেইলী (W. B. Bayley) বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করেন। এটি ছিল একটি বিবৃতি বা রিপোর্ট । তিনি সে সময়ে নাটোরে অবস্থান করছিলেন। ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জুন নাটোর থেকে প্রেরিত স্ট্রেচীর রিপোর্ট খানি একটি ঐতিহাসিক দলিল। সে সময়ে সার্কিট জজগণ স্ব স্ব অধিক্ষেত্রের অপরাধপ্রবণ এলাকায় সরেজমিনে এসে বড় বড় মামলার বিচারকাজ পরিচালনা করতেন। স্ট্রেচী রাজশাহীর বিশাল চলনবিল এলাকার আইন শৃংখলার অবনতির বিষয়ে বাস্তব তথ্য সংগ্রহ করে মুর্শিদাবাদের নিজামত আদালতে রিপোর্ট পেশ করলেন। এটি ছিল বেশ বড় একটি রিপোর্ট । এর সামান্য কিছু অংশ তুলে ধরা হল

“That Dacoity is very prevalent in Rajshahi has been ofen stated, but if its vast extent were known, if the scenes of horror, the murders, the burnings, the excessive cruelties, which are continually prepetrated here, were properly represented to government, I am confident that some measures would be adopted to remedy the evil.”

উপরের আংশিক বর্ণ না থেকে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় রাজশাহী জেলার সেসময়কার আইন শৃংখলা কোন পর্য ায়ে ছিল। সে সময়ে পুলিশ ও জমিদারের নায়েবগণ চোর ডাকাতদের অর্থে পুষ্ট ছিল। কোর্টে র পেশকার সেরেস্তাদার এরা ইংরেজ জজ-ম্যাজিস্ট্রেটগণের এদেশীয় ভাষা না জানার দুর্ব লতাকে পুঁজি করে চোর-ডাকাতদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা প্রদান করত। এভাবে রাজাশাহী অঞ্চল বিশেষ করে বিস্তীর্ণ চলনবিল অঞ্চল চোর ডাকাতদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছিল। নাটোরের জমিদার (রাজা) রামকৃষ্ণ নতুন চিরস্থায়ী ব্যবস্থার ফলে বার্ষি ক রাজস্ব প্রদান করতে অসমর্থ হওয়ায় মি: জে. এইচ. হ্যারিংটন (Mr. J. J. Harington) বিভাগীয় কমিশনার রাজশাহীর (খুব সম্ভবত রাজস্ব আদায় সম্পর্কিত বিভাগ) আদেশে ৬ মার্চ ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে কারারচদ্ধ হন।[১৭] রাজস্ব পরিশোধের প্রতিশ্রচতি প্রদান করলে ১৮ মার্চ ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে তিনি মুক্ত হন। কিন্তু যথাসময়ে নির্দি ষ্ট পরিমাণ রাজস্ব পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার ফলে নাটোর জমিদারীর অনেক পরগনা হাত ছাড়া হয়ে যায়। দেশের নব্য ধনী, মহাজন, দালাল, সরকারি কর্ম চারি এরা নতুন জমিদারি খরিদ করতে থাকে। এদের মধ্যে অনেকেই কোম্পানি সরকারকে সময়মতো রাজস্ব প্রদানের নিমিত্তে অর্থ উপার্জনের ভিন্ন পথ বেছে নেন। এদের অনেকেই চোর-ডাকাতদের আশ্রয় প্রশ্রয় দিত। লুণ্ঠনকৃত মালামাল নতুন জমিদারদের অনেকেই হেফাজতে রাখত। এমনকি নতুন জমিদারদের অনেকেই ডাকাতি করে অর্থ উপার্জন করত।

জেলার এইরূপ মারাত্মক পরিস্থিতির চিত্রটি উঠে এসেছে তদানীন্তন (১৮১০) গভর্ণ র জেনারেল লর্ড মিন্টোর একটি গুরচত্বপূর্ণ সভার কার্য বিবরণীতে। লর্ড মিল্টো প্রদত্ত বিবৃতির অংশ বিশেষ তুলে ধরা হল-

" A monastrous and- disorganised state of society existed under the eye of the supreme British authorities, and almost at that very seat of Government to which the country might justly look for safety and protection. The mischief could not wait for a slow remedy, the people were perishing almost in our sight. Every week delay was a doom of slaughter and torture against the defenceless inhabitants of very populous countries."

গভর্ণ র জেনারেলের বিবৃতি অত্যন্ত স্পষ্ট। বক্তব্যে তিনি এই জেলার আইন শৃংখলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে অত্যন্ত আন্তরিক, পাশাপাশি দস্যু-তস্করদের দ্বারা নির্য াতিত সাধারণ মানুষদের রক্ষা করার বিষয়টিও ফুটে উঠেছে তার বক্তব্যে। এভাবেই পাবনা একটি নতুন জেলা হিসেবে দ্রচত আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। প্রথমত এই এলাকার অবনতিশীল আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসাসহ মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার স্বার্থে। এরই ফলশ্রচতিতে তদানীন্তন কোম্পানি সরকার ১৬ অক্টোবর ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি প্রস্তাবনা পাশ করে পত্র নম্বর ৩১২৪ মোতাবেক মালদহের ম্যাজিস্ট্রেট এ. ডাবিলউ মাইলসকে (A. W. Milles) পাবনার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত করলেন। এখান থেকেই নতুন জেলার সূত্রপাত। তবে সেই মূহুর্তেই পাবনা জেলার সীমানা নির্দ্ধারিত হয়নি। ইত্যবসরে ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে সার্কিট কোর্ট অবলুপ্ত হয়ে যায় এবংরেভিনিউ কমিশনারের পদ সৃষ্টি হয়। পাবনা সে সময়ে রাজশাহীর রেভিনিউ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হতে থাকে। পাবনায় নিয়োজিত জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট রাজশাহীর রেভিনিউ কমিশনারের নিয়ন্ত্রণে কাজ করতে থাকেন। এরপর ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে পাবনার উক্ত জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট এককভাবে ডেপুটি কালেকটরের ক্ষমতা লাভ করলেন। এই ঘটনার সাত সপ্তাহ পর যশোর জেলার খোকসা থানা পাবনা জেলার সাথে সংযুক্ত হলো। আসলে পাবনা জেলা হিসেবে স্বাধীনভাবে কাজ শুরচ করে ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দ থেকে। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে ময়মনসিংহ জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সিরাজগঞ্জ ও বেলকুচি পাবনা জেলার সাথে সংযুক্ত হল।[১৮] ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জ মহকুমা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমাবস্থায়

শাহজাদপুর ও সিরাজগঞ্জ থানা দুইটি মি: এ. ব্যারী (Mr. A. Barry) নামক একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়ন্ত্রণে রাজস্ব আদায়সহ বিচারিক কাজ শুরচ হয়েছিল।

উপরে বর্ণিত রাজশাহী নামক জেলাটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশাল একটি এলাকার সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে বাস্তব প্রয়োজনে উনবিংশ শতাব্দীর শুরচ থেকে বিস্তীর্ণ এই জেলার অংশ চারিদিক থেকেই বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে গঙ্গার উত্তর পশ্চিমে পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত রাজশাহী জেলার অংশ বর্ধ মান, বীরভূম, মুর্শি দাবাদ, নদীয়া ও যশোর জেলার সাথে সংযুক্ত হলো। এরপর ১৮১৩, ১৮২১ ও ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে যথাক্রমে মালদহ, বগুড়া ও পাবনা জেলাগুলি সৃষ্টি হওয়ার ফলে একাধিক থানা রাজশাহী জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উলিলখিত নতুন জেলাগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হল। এর ফলে রাজশাহী জেলার আয়তন পূর্বে র তুলনায় অনেক হ্রাস পেল। এর মধ্যে রাজশাহী জেলার সীমানায় আরও সামান্য কিছু পরিবর্তন এসে গেল। গঙ্গা নদীর মধ্যে মরিচারদিয়ারচর নামক ১৬.৫০ বর্গ মাইল আয়তনবিশিষ্ট বিশাল ভূখন্ডটি(চর) ১৮৮১ থেকে ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে রাজশাহী জেলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পাশর্ব বর্তী নদীয়া জেলার সাথে সংযুক্তহল।[১৯] ১৮৯৬-৯৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই দিনাজপুর জেলা থেকে মহাদেবপুর থানা বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজশাহী জেলার সাথে সংযুক্ত হল।[২০] বগুড়া জেলার আদমদীঘি ও নবাবগঞ্জ থানার কিয়দংশ বিচ্ছিনণ হয়ে রাজশাহী জেলার সঙ্গে যোগ হল। এভাবেই দীর্ঘ দিনে সংযোজন ও বিয়োজনের মধ্যদিয়ে১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে এসে রাজশাহী জেলার আয়তন দাঁড়ালো ২৬১৮ বর্গ মাইলে। একই বছরের আদমশুমারী অনুযায়ী এই জেলার জনসংখ্যা ছিল ১,৪৮০,৫৮৭ জন।

১৯১৪ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহী জেলা গঠিত হয়েছিল তিনটি মহকুমার সমন্বয়ে। এগুলো হলো রাজশাহী সদর, নাটোর এবং নওগাঁ। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে নাটোর মহকুমা গঠিত হয়। নওগাঁ মহকুমা গঠন করা হয় ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। এই সময়ে সমগ্র জেলা ১৪টি থানা (রেভিনিউ ইউনিট) এবং ২৬টি পুলিশ স্টেশন এর সমন্বয়ে গঠিত হয়ে প্রশাসনিক কাজ পরিচালিত হত। রাজশাহী সদর মহকুমায় ছিল ৬টি থানা বা রেভিনিউ ইউনিট। এগুলি হচ্ছে, বোয়ালিয়া, বাগমারা, চারঘাট, গোদাগাড়ী, পুঠিয়া এবং তানোর। সদর মহকুমার পুলিশ স্টেশনগুলি ছিল বাগমারা, বোয়ালিয়া, নওহাটা, পবা, চারঘাট, রাজাপুর (বর্তমান বাঘা), গোদাগাড়ী, পুঠিয়া, দূর্গ াপুর তানোর ও মোহনপুর- এই মোট ১১টি। নাটোর মহকুমার থানাগুলি হচ্ছে- বড়াইগ্রাম (বুড়ীগাঁও), লালপুর, নাটোর ও সিংড়া। নাটোর মহকুমার পুলিশ স্টেশনগুলি হলো, বড়াইগ্রাম, গুরচদাসপুর, লালপুর, ওয়ালিয়া (বড়াল নদ তীরবর্তী), নাটোর, বাগাতিপাড়া, সিংড়া ও নন্দীগ্রাম (বর্তমানে বগুড়া জেলার অন্তর্ভূ ক্ত)। নওগাঁ মহকুমার থানা সমূহ হচ্ছে মহাদেবপুর, মান্দা,

নওগাঁ ও পাঁচুপুর (আত্রাই)। এই মহকুমার পুলিশস্টেশনগুলি হচ্ছে, মহাদেবপুর, মান্দা, নিয়ামতপুর, নওগাঁ, বদলগাছি, নন্দনালি (রানীনগর)ও পাঁচুপুর (আত্রাই)। পরবর্তীকালে পুলিশ স্টেশনের সংখ্যা কমে এসে ২২টিতে দাঁড়ায়।[২১]

১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট যথাক্রমে পাকিস্তান ও ভারত বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৪৭ সালের ১৯ আগস্ট তারিখ থেকে ভারতের মালদহ জেলা থেকে নবাবগঞ্জ, নাচোল, বিচ্ছিনণ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হল। এই পাঁচটি থানা নিয়ে চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমা গঠিত হয়ে রাজশাহী জেলার সঙ্গে সংযুক্ত হল। দিনাজপুর জেলা থেকে (পশ্চিম দিনাজপুর, ভারত) পোরশা, পত্নীতলা এবং ধামুইরহাট থানা তিনটি বিচ্ছিনণ হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হল১৯৪৮ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর তারিখে উলিলখিত থানাসমূহ বগুড়া জেলার সঙ্গে সংযুক্ত হল। ১৯৪৯ সালে উক্ত থানা তিনটির মধ্যে পোরশা থানা নবাবগঞ্জ মহকুমার সাথে যুক্ত হয়। অপর দুইটি ধামইরহাট ও পত্নিতলা নওগাঁ মহকুমার সাথে জুড়ে দেয়া হয়।[২২] এর অল্পদিন পর পোরশা নওগাঁ মহকুমার সাথে সংযুক্ত হয়। ১৯৫৪ সালে ভারতের সাথে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের সীমানার (রাজশাহী জেলা) আরও কিছু ভাগবাটোয়ারা হয়ে গেল। এটি ১৯৫৪ সালের বাগ্নী রোয়েদাদ নামে পরিচিত। এইবণ্টন অনুসারে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে কয়েকটি মৌজা যার মোট আয়তন২৪,৭৪০ একর রাজশাহী জেলার সাথে যুক্ত হয়। অপরপক্ষে রোয়েদাদের চুক্তি অনুসারে রাজশাহী জেলার মোট ২২টি মৌজা (মোট আয়তন ১৬,৭৯৬ একর) মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্ভূক্ত হয়।

১৯৪৭ সালের পূর্ব পর্যন্ত রাজশাহী জেলা মোট২২টি থানা এবং ৩টি মহকুমার সমন্বয়ে গঠিত ছিল। দেশ বিভাগের পর চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহকুমার ৫টি থানা এই জেলার সাথে সংযুক্ত হয়ে মোট ২৭ থানার সমন্বয় ঘটে। পরবর্তীকালে আরও ৫টি থানা সৃষ্টি হয়ে সর্ব মোট থানার সঙ্খ্যা দাঁড়ায় ৩২টিতে। ১৯৮৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত বৃহত্তর রাজশাহী জেলা৩২টি থানা ও ৪টি মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল। ১৯৮৪ সালে সরকারি আদেশে মহকুমাগুলি স্বতন্ত্র জেলায় উন্নীত হয়। এর ফলে রাজশাহী সদর মহকুমা নিয়েই বর্তমানকালের রাজশাহী জেলা নতুন করে গঠিত হল। পূর্বে রাজশাহীসদর মহকুমায় থানার সংখ্যা ছিল ১০টি। ১৯৯২ সালে রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের কার্যক্রম শুরচ হলে বোয়ালিয়া থানার সম্পূর্ণ অংশ মেট্রোপলিটান এলাকায় চলে আসে। এর ফলে বর্তমানে৯টি উপজেলা নিয়ে রাজশাহী জেলা গঠিত। রাজশাহী মেট্রোপলিটন গঠিত হয়েছে ৪টি থানার সমন্বয়ে। এগুলি হচ্ছে বোয়ালিয়া, শাহমখদুম, রাজপাড়া ও মতিহার। পবা উপজেলার ব্যাপক অংশ উলিলখিত চারটি থানার মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। বর্তমান রাজশাহী জেলার আয়তন২,৪০৭.০১ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা(২০১০

সালের হিসাব মতে) ২৪,৬৭৮৪১ জন। এই জেলার উপজেলাগুলি হচ্ছে- পবা, পুঠিয়া, চারঘাট, বাঘা, মোহনপুর, বাগমারা, দূর্গ াপুর তানোর ও গোদাগাড়ী।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার আয়তন ১,৭০২.৫৬ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ১৪,১৯৫৩৬ জন। উপজেলাগুলি হলো- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, শিবগঞ্জ, ভোলাহাট, নাচোল ও গোমস্তাপুর।

নাটোর জেলার আয়তন ১,৯০২.৯১ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা১৬,৭৮৬৫৯ জন। উপজেলা সমূহ- নাটোর, লালপুর, বাগাতিপাড়া, সিংড়া, বড়াইগ্রাম ও গুরচদাসপুর।

নওগাঁ জেলার আয়তন ৩,৪৩৫.৬৭ বর্গ কিলোমিটার। মোট জনসংখ্যা ২৩,৭৭,৩১৪ জন। মোট উপজেলা ১১ টি। এগুলি হল- নওগাঁ, আত্রাই, রাণীনগর, পত্নীতলা, সাপাহার, পোরশা, মান্দা, মহাদেবপুর, ধামইরহাট, বদলগাছী ও নিয়ামতপুর।

কোম্পানি সরকার কর্তৃর্ক বাংলাদেশের প্রশাসনিক ইতিহাসের শুরচ হয়েছিল ১৭৬৯ খ্রিষ্টাব্দে। সে বছর বঙ্গাদেশের বৃহত্তর কয়েকটি জেলায় কোম্পানি কর্তৃর্ক নিয়োজিত হয়েছিল সুপারভাইজার নামের রাজস্ব আদায়কারী অফিসার। এরপর ১৭৮১ খ্রিষ্টাব্দে যশোরের মুড়লীতে প্রথম আদালতের কার্য ক্রম শুরচ হয়। ১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশ অফিসার টিলম্যান হেঙ্কেলের নেতৃত্বের যশোরের মুড়লীতে সর্ব প্রথম কালেকটরেট স্থাপনের[২৩] মধ্য দিয়ে বর্তমানকালের জেলা প্রশাসনের প্রাতিষ্ঠানিক কর্ম কান্ড শুরচ হয়। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার The Bengal Revenue commissioners Regulation জারি করে। এর ফলে সর্ব প্রথম কমিশনার নিয়োগপ্রাপ্ত হয়। কমিশনার 'বোর্ড অব রেভিনিউ এর নিয়ন্ত্রণে থেকে জেলাসমূহের অধঃস্তন অফিসগুলি তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পায়। প্রথমাবস্থায় কমিশনারগণ সিভিল কোর্টে র ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। কমিশনারগণ ক্রিমিন্যাল জজ অব সার্কিট (Criminal Judege of Circuit) হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন। কমিশনারগণকে উলিলখিত কাজের পাশাপাশি কালেকটরগণের আদেশের আপিল শুনানির দায়িত্বও প্রদান করা হল। এর ফলে প্রত্যক্ষ করা গেল। কমিশনারগন ফৌজদারি দেওয়ানী ও রাজস্ব বিষয়ক কাজগুলির তদারকি ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব পালন করছেন। ইত্যবসরে বৃহত্তর বিহার ও বাংলাকে (উড়িষ্যার কয়েকটি জেলাসহ) মোট ৯টি বিভাগে বিভক্ত করা হল। প্রতিটি বিভাগে একজন বিভাগীয় কমিশনার নিয়োগ পেলেন। বিভাগগুলি ছিল ১. বর্ধ মান্ ২. প্রেসিডেন্সি, ৩. রাজশাহী, ৪. ঢাকা, ৫. চট্টগ্রাম, ৬. পাটনা, ৭. ভাগলপুর, ৮. উড়িষ্যা ও ৯. ছোট নাগপুর। বাংলার মধ্যে ৪টি বিভাগ ছিল। এগুলি হল-

ক. প্রেসিডেন্সি বিভাগ

১. চবিবশ পরগণা, ২. কলকাতা, ৩. নদীয়া, ৪. যশোর, ৫. খুলনা ও ৬. মুর্শিদাবাদ।

খ. ঢাকা বিভাগ

১. ঢাকা, ২. ফরিদপুর, ৩. বাকেরগঞ্জ ও ৪. ময়মনসিংহ।

গ. রাজশাহী বিভাগ

১. রাজশাহী, ২. দিনাজপুর, ৩. রংপুর, ৪. বগুড়া, ৫. পাবনা, ৬. মালদহ, ৭. জলপাইগুড়ি ও ৮. দার্জিলিং।

ঘ. চট্টগ্রাম বিভাগ

১. চট্টগ্রাম, ২. নোয়াখালী ও ৩. ত্রিপুরা (সদর দপ্তর কুমিললা)। সিলেট জেলা ১৮৭৪ খ্রিষ্টাব্দে আসাম প্রদেশের অন্তর্ভূক্ত হয়।

রাজশাহী শহরে (রামপুর বোয়ালিয়া) বিভাগীয় কমিশনারের সদর দপ্তর ছিল বহুকাল। ১৮৭৭ খ্রিষ্টাব্দে নর্দ ানবেঙ্গল স্টেট রেলওয়ে সাড়া(ঈশ্বরদী) থেকে জলপাইগুড়ি পর্য ন্ত যাতায়াত শুরচ করে। বিভাগীয় সদরদপ্তর রামপুর বোয়ালিয়ার (রাজশাহী) সাথে তখন অবধি কোন রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়নি। এই শহরের সাথে শুধুমাত্র কষ্টকর স্থলপথ এবং সুন্দর নদীপথের যোগাযোগ ছিল। এই শহরের আবহাওয়া চরমভাবাপন্ন। এখানে অবস্থানরত ইউরোপীয় অফিসারগণের সুন্দর আবহাওয়া ও সহজযোগাযোগের জন্য কর্তৃপক্ষ ১৮৮৮ খ্রিষ্টাব্দে রামপুর বোয়ালিয়া থেকে বিভাগীয় সদর দপ্তর জলপাইগুড়ি শহরে স্থানান্তরিত করে।[২৪] দেশ বিভাগের পর ১৯৪৭ সালের আগস্ট মাসে বিভাগীয় সদর দপ্তর পুনরায় রাজশাহী শহরে স্থাপিত হয়। মাঝে বহরমপুরে বিভাগীয় সদরদপ্তরের কাজ চলেছে বেশ কিছুকাল।

দার্জিলিং জেলাটি ছিল সিকিমের রাজার রাজ্যের অংশ। ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে সংঘটিত ভুটান যুদ্ধের পর ইংরেজগন সিকিমের রাজার নিকট থেকে দার্জিলিংয়ের অধিকার চাইলেন। সিকিমের রাজা একটি দানপত্রের মাধ্যমে দার্জিলিং বৃটিশ কোম্পানির কাছে হস্তান্তর করলেন। এ সম্পর্কীয় দানপত্রের ভাষা হুবহু উদ্ধৃত করার মধ্যদিয়ে রাজশাহী জেলা ও বিভাগ গড়ে উঠার আলেখ্য শেষ করা হবে।

“The Governor-General, having expressed his desire for the possession of the hill of Derjeeling on account of its cool climate, for the purpose of

enabling the servents of his Government suffering from sickness, to avail themselves of its advantages I, the sikkimputtee Raja, out of friendship for the said Governor-General, here by present Derjeeling to the East India company, that is all the lands south of the great rangit river, east of Balasur kahil and little rangit rivers and west of rungpo and mahanadi rivers". দার্জিলিং জেলা পরবর্তী সময়ে ভাগলপুর বিভাগের সাথে যুক্ত হয়ে যায়।

রাজশাহী শহরের গোড়াপত্তন

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান রাজশাহী শহরের পাশ দিয়ে প্রবাহিত হত মহানন্দা নদী।[২৫] পদ্মা ছিল এখান থেকে আরও ১০ কিলোমিটার দক্ষিণে। সে সময় সরদহর ভাটিতে পদ্মার সাথে মহানন্দার মিলন হত। মহানন্দা থেকে বারাহী,[২৬] স্বরমংলা বা রাঁইচাদ,[২৭] নারদ এ সকল শাখা নদ-নদীসমূহের জন্ম। এই নদ-নদীগুলির পলল দ্বারা সৃষ্ট ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আজকের রাজশাহী শহর। কাদা, পলি ও বালি দ্বারা সৃষ্ট এই স্থানটিতে জনপদ গড়ে উঠেছে অনেক পরে। সেই বিবেচনায় স্থানটিকে নবীন বলা চলে।

পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকালে উত্তর বাংলার বড় একটি অংশের নাম ছিল বরেন্দ্র। এটি ছিল সে সময়কার প্রশাসনিক বিন্যাসে একটি মন্ডল (বিভাগ)। অনেকগুলি মন্ডল নিয়ে গঠিত হত একটি ভূক্তি বা প্রদেশ। বরেন্দ্র মন্ডল ছিল পুন্ড্রবর্ধ ন নামক ভূক্তির অন্তর্ভূ ক্ত। পাল ও সেন রাজাদের রাজত্বকালে বর্তমান রাজশাহী শহরের স্থানটিতে কোন জনবসতি গড়ে উঠেছিল কিনা, ইতিহাসে নির্দি ষ্ট করে এ বিষয়ের কোন উলেলখ নেই। তবে বর্তমান রাজশাহী শহর থেকে ১৪ কিলোমিটার পশ্চিমে 'বিজয়নগর' নামে একটি প্রাচীন জনপদ রয়েছে। সেন নৃপতি বললাল সেনের পিতা বিজয়সেন[২৮] এখানে তাঁর রাজধানী নির্মাণ করেছিলেন বলে ঐতিহাসিকগণের অভিমত। বিজয়নগর থেকে ৬/৭ কিলোমিটার উত্তর দিকে দেওপাড়া বা দেবপাড়া নামক পললীটি নানা কারণে বিখ্যাত। এই প্রাচীন গ্রামে পাওয়া গেছে একটি শিলালিপি। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে মি. মেটকাফ (CT. Metcalfe) এটি উদ্ধার করেন।[২৯] শিলালিপি থেকে জানা যায়, দক্ষিণ ভারতের কর্ণ াটক অঞ্চলের জনৈক সামন্ত সেনের পৌত্র ও হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয়সেন পাল বংশীয় রাজাদের কাছ থেকে গৌড় রাজ্য জয় করেন। শিলালিপিটি শিল্পী শুলোপানি কর্তৃক উৎকীর্ণ এবং কবি উমাপতি ধর কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত। এই শিলালেখ বা প্রস্তরলিপির অক্ষরগুলির মধ্যে ২২টি অক্ষর প্রায় বাংলা অক্ষরের মতো অর্থ াৎ আদি

বাংলা অক্ষর (Proto Bengali Script)। শিলালিপিটি পাঠ করে জানা যায়, রাজা বিজয় সেন এই এলাকায় মন্দিরসহ দীঘি জলাশয় খনন করেন। প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির ও দীঘির উলেলখ রয়েছে প্রস্তরলিপিতে। এলাকায় বহুল পরিচিত 'পদুমশার' দীঘিটি[৩০] (পরিবর্তিত ও বিকৃতরূপ) আসলে প্রদ্যুম্নেশ্বর দীঘি এতে সন্দেহ নেই। বর্তমানে মন্দিরের অস্তিত্ব নেই। দেওপাড়া-বিজয়নগর-কুমারপুর-পালপাড়া-ব্রাহ্মণপুষ্করিণি, ধর্মপুর, প্রেমতলী (প্রেমস্থলী), খেতুরসহ বিশাল একটি অঞ্চল জুড়ে প্রাচীন আমলের ইট, পাথর, মৃতপাত্রের ভগ্নাংশ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়ানো ছিটানো লক্ষ্য করা যায়। গ্রামগুলিতে রয়েছে অসংখ্য প্রাচীন দীঘি, প্রত্ন ইমারতের ভিত্তি ও ধ্বংসাবশেষ। এই অঞ্চলটি ছিল সেন রাজা বিজয়সেনের রাজধানী 'বিজয়নগর' বা 'বিজয়পুর'।[৩১] এর সময়কাল খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী। এরও পূর্বে পাল রাজত্বের সময় রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলাধীন বিহারৈলধানোরা-পাড়িশোঁ-মাদারিপুর (রাজশাহী মহানগর থেকে ৩২ কিলোমিটার উত্তরে) এই গ্রামগুলি ছিল সমৃদ্ধশালী নগর জনপদ। উলিলখিত গ্রাম সমূহে এখনও প্রাচীন দীঘি, জলাশয়, ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধবিহার, পরিখা, রাজবাড়ী বুরচজ ইত্যাদির চিহ্ন রয়েছে। পাল নৃপতিগণ আত্রাই নদীর প্রাচীন প্রবাহের পার্শ্বে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। বর্তমানে এটি মৃত প্রবাহ এবং নিম্ন জলাভূমিতে (বিল) পরিণত হয়েছে।

হিজরী ৬৫৬ এবং খ্রিষ্টীয় ১২৫৮ সালের ১০ ফেব্রচয়ারি আববাসীয় শেষ খলীফা মুস্তাসিম বিললাহ তাঁর শিয়া মতাবলম্বী মন্ত্রী মুহম্মদ ইবনে আল্কামীর পরামর্শে মোঙ্গলবীর হালাকু খানের নিকট উপস্থিত হয়ে আত্মসমর্পণ করলে অতি সহজেই হালাকু খান বিজয়ী হন এবং মুস্তাসিম বিললাকে হত্যা করে বাগদাদ নগরী ধ্বংস করেন। বাগদাদের লক্ষ লক্ষ মানুষকে হত্যা করা হয়। সে সময়ে বাগদাদ থেকে অনেক সুফী দরবেশ এবং জ্ঞান তাপস মনীষী ব্যক্তিগণ জীবন বাঁচিয়ে কাবুল, কান্দাহার, দিললী এ সকল শহরগুলিতে এসে আশ্রয় নিতে থাকেন। এদের মধ্যে বড়পীর হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রহ.) এর পুত্র আজাললা শাহ এবং পৌত্র সৈয়দ মনির আহমদ (রহ.), হযরত শাহ্ মখদুম রূপোশ (রহ.), সৈয়দ আহমদ তন্নরী (রহ.) ওরফে মিরান শাহ ছিলেন অন্যতম। দিললী থেকে সুলতান ফিরোজ শাহের সহায়তায় এরা বাংলায় ইসলাম প্রচারের উদ্দেশ্যে প্রথমে পান্ডুয়াতে[৩২] (বাংলার প্রাচীন রাজধানী/মালদহ, ভারত) আগমন করেন। সেখান থেকে হিজরী ৬৮৫ খ্রিষ্টাব্দে চলে আসেন নোয়াখালীতে। হিজরী ৬৮৭ সালে (ইং ১২৮৮-৮৯) তাঁদের আগমন ঘটে রাজশাহীতে। সেই সময়ে বর্তমান রাজশাহী শহরে তেমন কোন জনপদ গড়ে উঠেনি। বর্তমান দরগাহপাড়া ও এর সন্নিহিত এলাকা মহাকালগড়[৩৩] নামে পরিচিত ছিল। এখানে ছিল দেও দৈত্যের প্রতিমূর্তিসহ মন্দির এবং

বিশাল দীঘি। এদের পূজারী ছিলেন দেওপাড়া নামক জনপদের দুইজন সামন্ত। মাঝে মধ্যে এরা মন্দিরে নরবলি দিয়ে দেও দানবের পূজা করতেন। পার্শ্বেই ছিল মহানন্দা নদী। কিছু জালিক কৈবর্ত মহাকালগড়ে বসবাস করতো। এই সময়ে বাংলার সিংহাসন রক্ষার জন্য তুগরল খাঁন ছিলেন ব্যতিব্যস্ত, অন্যদিকে দিললীর সম্রাট গিয়াসউদ্দীন বলবন ব্যস্ত ছিলেন তার পশ্চিম সীমান্ত নিয়ে যেখানে বার বার মোঙ্গল বাহিনী (হালাকু খাঁনের পরবর্তী সময়ে) হানা দিচ্ছে। বাংলার রাজধানী গৌড় কিম্বা পান্ডুয়া থেকে বেশ দূরে অবস্থিত মহাকালগড় ছিল দেওপাড়া এলাকার সামন্ত জমিদারদের অধীনে। মহাকাল গড় নামক জনপদের মানুষদের উপর এরা নির্য াতন চালাত নানাভাবে। সেই যুগ সন্ধিক্ষণে বাগদাদ থেকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে হযরত তুরকান শাহ নামে একজন দরবেশ মহাকালগড়ে এসে উপস্থিত হলেন। স্থানীয় মানুষদের ইসলামের ছায়াতলে আসার আহবান জানালেন। দৈত্য পূজারী যুবরাজদ্বয়ের কর্ণ গোচর হওয়ায় তাদের হাতে ১২৭৯ খ্রি. নির্ম মভাবে শহীদ হলেন তুরকান শাহ। হযরত তুরকান শাহ এর মাযার রয়েছে রাজশাহী সরকারি কলেজ হোস্টেলের দক্ষিণ দেয়াল সংলগ্ন স্থানটিতে।

হযরত শাহ্ মখদুম রূপোশ (রাহ.) তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে মহাকালগড়ে এসে দেও রাজাদের বিরচদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করলেন। মহাকালগড়ে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহে ইসলাম প্রচার শুরচ হল। এভাবে মহাকালগড় আস্তে আস্তে জনপদে পরিণত হতে থাকে। শাহ্ মখদুম (রহ.) হিজরী ৭১৩ সালে মৃত্যুবরণ করলে এখানেই তাঁকে সমাহিত করা হয়। এরপর থেকে স্থানটি বোয়ালিয়া বা বুয়ালিয়া নামে অভিহিত হতে থাকে। 'বু' ফারসি শব্দ। অর্থ হচ্ছে গঞ্জ। 'ওয়ালি' আরবী শব্দ। অর্থ হচ্ছে- আল্লাহর কাছের মানুষ। বহুবচনে আওলিয়া পরিপূর্ণ অর্থ দাঁড়াচ্ছে আশুলিয়াগণের সুবাসিত স্থান। প্রথম অবস্থায় স্থানটিতে একটি কাঁচা মসজিদ এবং একটি মাদরাসা নির্মি ত হয়েছিল। দূর দূরান্ত থেকে ভক্তবৃন্দ এখানে আসতেন ধর্মীয় কারণে। তখন অবধি বুয়ালিয়া কোন বাণিজ্য কেন্দ্র কিংবা ছোট আকারের শহরের রূপ গ্রহণ করেনি।

১৬০৯ সালে আব্দুল লতিফ[৩৪] নামক একজন ভ্রমণকারী বাংলার নবনিযুক্ত সুবাদার ইসলাম খান চিশতীর সহগামী হয়ে বাংলায় এসেছিলেন। আব্দুল লতিফ ছিলেন গুজরাটস্থ আহমদাবাদের আব্দুললাহ আববাসীর পুত্র এবং বাংলার নতুন দীওয়ান আবুল হাসান মুতাকিদ খাঁনের বিশ্বস্ত অনুচর। ৭ ডিসেম্বর ১৬০৯ সালে আব্দুল লতিফ মুতাকিদ খাঁন ও ইসলাম খান চিশতীর সাথে নৌবহরসহ রাজমহল ত্যাগ করেন। গঙ্গা এবং পদ্মার পথ ধরে বাঘা থানাধীন পদ্মা তীরবর্তী সামরিক ঘাঁটি আলাইপুরে এসে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন। আব্দুল লতিফ সে সময়কার বাঘা এবং আলাইপুরের

যে বর্ণ না দেন তাতে পরিস্কার ধারণা করা যায়স্থান দুটি বেশ উন্নত এবং বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। আব্দুল লতিফ রাজমহল থেকে আলাইপুর পর্য ন্ত নদীপথে গঙ্গার পশ্চিম তীরের তান্ডা এবং গোয়াশ নামক জনপদের বর্ণনা দিয়েছেন, কিন্তু পূর্ব পাড়ের বুয়ালিয়া বা বোয়ালিয়া সম্পর্কে কোন উলেলখ করেননি। এর কারণ হচ্ছে, সেই সময়কাল পর্য ন্ত বোয়ালিয়া একটি বর্দ্ধিষ্ণু জনপদরূপে বা বাণিজ্যিক বন্দররূপে প্রতিষ্ঠা পায়নি।

খ্রিষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্য ন্ত অনেক বিদেশী পর্য্যটক, নাবিক, ব্যবসায়ী, রাজকর্মচারী ভারতবর্ষ তথা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল ঘুরে ঘুরে দেখেছেন। বিভিন্ন পেশার এ সকল ব্যক্তিগণ ছিলেন প্রধানত পর্তুগীজ, ডাচ (নেদারল্যান্ড), ফ্রেঞ্চ ও ইংরেজ। বাংলার নদীপথগুলি ঘুরে তাদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে নক্সা ও মানচিত্র তৈরি করেছেন। এদের মধ্যে উলেলখযোগ্য হচ্ছেন জে.ডি. ব্যারোস (১৫৫০), গ্যাস টালডি (১৫৬১), ফনডেন ব্রচক (১৬৬০) এবং ইংরেজ প্রকৌশলী মেজর জেমস রেনেল (১৭৬১)। বাংলার প্রথম মানচিত্র অংকন করেছেন চুঁচুড়ার ওলন্দাজ গভর্ণ র ফনডেন ব্রচক১৬৬০ খ্রিষ্টাব্দে। প্রথম এই মানচিত্রের মাধ্যমে বুয়ালিয়া নামটির উলেলখ লক্ষণীয়। ব্রচকের ঐ নক্সায় পদ্মার প্রশস্ত প্রবাহ ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জের মাঝ দিয়ে দক্ষিণ শাহবাজপুর (ভোলা) হয়ে বঙ্গোপসাগরে গিয়ে মিশেছে। অপর একটি প্রবাহ বুয়ালিয়ার পাশ দিয়ে (খুব সম্ভবত বর্তমান বড়ালের প্রবাহপথে) চলন বিলের ভিতর দিয়ে ধলেশ্বরীর খাত (সে সময়ে যমুনা নদীর সৃষ্টি হয়নি) বেয়ে ঢাকার পাশ দিয়ে (বুড়িগঙ্গা হয়ে) মেঘনায় মিশতো এবং সর্ব শেষে সমুদ্রে পতিত হতো। ফনডেন ব্রচক আসলে সে সময়কার বাংলাদেশের পরিপূর্ণ মানচিত্রটি এঁকেছিলেন জাও.ডি. ব্যারোস (১৫৫০) কর্তৃক অংকিত বাংলার মানচিত্রকে অবলম্বন করে। ১৬৬০ সালে ব্রচক কর্তৃক অংকিত মানচিত্রটিতে শুধুমাত্র নৌপথের উলেলখ ছিল না বরং স্থলপথের একটি গুরচত্বপূর্ণ (রাজপথ) বর্ণ নাও এতে তিনি দিয়ে গেছেন। খুব সম্ভবত এটি ছিল মোঘলদের একটি সামরিক পথ। উলিলখিত এই রাজপথটি মূলত শেরশাহ কর্তৃক নির্মি ত বিখ্যাত গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোডের সাথে সংযুক্ত ছিল। মানচিত্রটি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে রাজপথটি কাশিমবাজার হয়ে পদ্মার পূর্ব পাড়ে বুয়ালিয়া এবং নাটোর হয়ে উত্তর-পূর্ব পথে বগুড়ার মধ্য দিয়ে আরও উত্তরপূর্ব দিকে আসাম অবধি চলে গেছে। আরেকটি পথ ঢাকা থেকে শুরচ হয়েছে। ধলেশ্বরী পার হয়ে উত্তর দিকে পাবনা, শাহজাদপুর এবং চলনবিলের মধ্যে অবস্থিত হান্ডিয়াল[৩৫] নামক সে আমলের করতোয়া তীরের বিখ্যাত নৌবন্দর অবধি চলে গেছে।

বুয়ালিয়া বা বোয়ালিয়ার প্রাচীনত্ব আলোচনায় আসলে প্রথমেই এই মানচিত্রটির প্রসঙ্গ এসে যাবে। কারণ ভনডেন ব্রচক অংকিত মানচিত্রটির মাধ্যমেই সর্ব প্রথম পরিচিতি পেয়েছে বোয়ালিয়া নামের জনপদটি। বোয়ালিয়া বা রাজশাহী জনপদ থেকে শহর হিসেবে গড়ে উঠবার ক্ষেত্রে দুইটি প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ছিল মূখ্য। একটি শাহ মখদুম রূপোশ (রাহ) এর মাযার অর্থাৎ বর্তমান দরগাহপাড়া ও সন্নিহিত এলাকা এবং অপরটি ওলন্দাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (Dutch East India Company) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বড়কুঠি।

প্রথমে হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.) এর মাযার শরীফ নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্য ন্ত বোয়ালিয়া কিংবা রাজশাহীর কোন প্রসিদ্ধি অথবা নামের বিশেষ উলেলখ পাওয়া যায় না। অথচ সে সময়ের বহু পূর্ব থেকেই গঙ্গা(পদ্মা) তীরবর্তী আলাইপুর[৩৬] ছিল গৌড় সুলতানদের সামরিক ঘাঁটি বা ছাউনী। শুধু তাই নয়, আলাইপুরসহ এর পার্শ্ববর্তী বাঘা গড়ে উঠেছিল একটি শিক্ষা ও সংস্কৃতির শহররূপে।

হযরত শাহ মোকাররম (রহ.) ওরফে মীর্যা আলী কুলী বেগ একজন বিখ্যাত সুফীসাধক হিসেবে পরিচিত। তিনি ছিলেন হযরত বড়পীর মহিউদ্দীন আব্দুল কাদির জিলানী (রহ.) এর বংশধর। তাঁর আরও পরিচয় হচ্ছে প্রতাপশালী পারস্য সম্রাট শাহ আববাসের তিনি ছিলেন প্রধান সেনাপতি। তাঁর বংশধর হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.) এর মাযার যিয়ারত করার জন্য পারস্য সম্রাট শাহ আববাস সেনাপতি মীর্যা আলী কুলী বেগকে প্রেরণ করেছিলেন রাজশাহীতে। মীর্যা আলী কুলী বেগ তাঁর খান্দানের দরবেশ, যিনি শায়িত আছেন পদ্মা তীরে বুয়ালিয়ার দরগাহপাড়ায়, নিজে মাযারে উপস্থিত হয়ে যিয়ারত করলেন। স্বদেশে ফিরে না গিয়ে তিনি এখানেই রয়ে গেলেন। এরপর হিজরী ১০৪৫ মোতাবেক ১৬৩৪ সালে শাহ মখদুম রূপোশ (রহ) এর মাযার শরীফ ও এর চারিদিকে পাকা দেয়াল দ্বারা ঘিরে দেন। মাযারের উপর গম্বুজ নির্মাণ করেন। তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ এবং এক গম্বুজবিশিষ্ট হুজরাখানা নির্মাণ করেন। সুরম্য একটি তোরণ তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়। এরপর তিনি বোয়ালিয়া ত্যাগ করে ১৫/১৬ কিলোমিটার পশ্চিমে কুমরপুর এলাকায় গিয়ে ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। ইংরেজী ১৬৬২ খ্রিষ্টাব্দে হযরত শাহ মোকাররম (রহ.) ওরফে মীর্যা আলী কুলী বেগ মৃত্যুবরণ করলে কুমরপুরে তাঁকে সমাহিত করা হয়। ১৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে দরগাহপাড়ায় হযরত শাহ মখদুম (রাহ.) এর মাযার ও মসজিদ সংস্কার হবার পর চারিদিক থেকে ভক্তবৃন্দের আগমন বৃদ্ধি পেতে থাকে। শুধু সাধারণ ভক্তবৃন্দ মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে বুয়ালিয়া আসতেন না। দেশ বিদেশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ এই মাযার যিয়ারত করতে আসতেন। ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব এবং ১৬৭৪ খ্রিষ্টাব্দে

পারস্যের প্রধানমন্ত্রী মোজাফ্ফর শাহ দিললীতে এসে আওলিয়া দরবেশগণের মাযারসমূহ যিয়ারত শেষে রাজশাহীতে এসে প্রথমে হযরত শাহ মখদুম (রহ.) এর মাযার যিয়ারত করেন এবং শেষে কুমরপুরে গিয়ে মীর্যা আলীকুলী বেগের মাযার যিয়ারত করেন। মাযারকে কেন্দ্রকরে আস্তে আস্তে জনপদটি সমৃদ্ধির দিকে এগুতে থাকে। কিন্তু তখন অবধি এই স্থানটিকে শহর কিংবা শহরের গোড়াপত্তন হয়েছে, বাস্তব অবস্থা এমন ছিল না। বরং সেই সময়ে বোয়ালিয়ার চেয়েও উন্নত ও সমৃদ্ধ জনপদ হিসেবে গড়ে উঠেছিল রাজশাহীর বাঘা, আলাইপুর, চাপিলা, পুঠিয়া, তাহিরপুর এ সকল স্থানগুলি।[৩৭]

বোয়ালিয়া নৌবন্দর হিসেবে গড়ে উঠার সূত্রপাত ঘটে পদ্মাতীরে ওলন্দাজ বণিকদের দ্বারা বড়কুঠি[৩৮] নামক একটি পাকা দ্বিতল ভবন নির্মাণের মধ্য দিয়ে। ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৬০২ খ্রিষ্টাব্দে। বাংলায় ব্যবসা এবং কুঠি নির্মাণের জন্য ওলন্দাজদের অপেক্ষা করতে হয় ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত।

যে সকল ইউরোপীয় দেশের ব্যবসায়ীগণ ভারতবর্ষ বিশেষ করে বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরচত্বপূর্ণ অবস্থানে ছিল এদের মধ্যে ওলন্দাজগণ অন্যতম। এরা ভারতের করমন্ডল উপকূলের (দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূল) মুসলিপাটনাম (অধুনা অন্ধ্রপ্রদেশ) নামক শহরে ১৬০৫/১৬০৬ সালে প্রথম ফ্যাক্টরী নির্মাণের মাধ্যমে ব্যবসা শুরচ করে। এদের উপনিবেশ ছিল বাটাভিয়ায় (বর্তমান জাকার্তাসহ জাভা দ্বীপ)। মালাক্কার মসলা সমৃদ্ধ দ্বীপগুলিও এদের দখলে ছিল। ওলন্দাজগণ ইন্দোনেশিয়ার এ সকল অঞ্চল থেকে মসলা ও চিনি ইরানসহ ইউরোপে নিয়ে যেত। বাংলায় নদী পথে প্রবেশের জন্য ছিল দুটি বড় ও পরিচিত মোহনা। একটি হুগলী এবং অপরটি মেঘনা। কিন্তু উভয় মোহনা পর্তুগীজ এবং মগ জলদুস্যদের সন্ত্রাসী কর্মকান্ডের দ্বারা ছিল বিপর্যস্ত এবং নিরাপত্তাহীন (সম্রাট আকবরের অনুমতি পেয়ে ১৫৮০ সালে পর্তুগীজরা হুগলী বন্দরে শক্তভাবে জেঁকে বসেছিল)। পর্তুগীজদের এহেন কর্মকান্ডের বিরচদ্ধে বাংলার সুবাদার কাশিম খান হুগলীর পর্তুগীজ ঘাঁটি আক্রমণ করে তাদের সেখান থেকে বিতাড়িত করলেন ১৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে। এরপর থেকেই ওলন্দাজ বণিকগণ সত্যিকার অর্থে বাংলায় প্রবেশ করেএবং প্রথমে হুগলীতে ফ্যাক্টরি নির্মাণ করে। এর পূর্বে উড়িষ্যার পিপলী নামক শহরে তাঁদের বাণিজ্যিক ঘাঁটি ছিল। ওলন্দাজগণ ১৬৪৭ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই হুগলী, কাশিম বাজার, পাটনা ছাপড়া, সিঙ্গিয়া গঙ্গা তীরবর্তী এ সকল এলাকায় কুঠি নির্মাণ করে। ১৬৫০ সালে ঢাকা এবং ১৬৭৬ সালে মালদহতে কুঠি নির্মাণ করে। ১৬৩২ থেকে ১৬৭৬ এই সময়কালের মধ্যে ওলন্দাজ বণিকেরা হুগলী থেকে পাটনা পর্যন্ত গঙ্গার ধারে এবং পাটনা থেকে ঢাকা

অবধি গঙ্গা ও পদ্মারপাড়ে বেশ কয়েকটি কুঠি নির্মাণ করে। পদ্মা তীরবর্তী বুয়ালিয়া বা রাজশাহীর বড়কুঠি নামক ওলন্দাজ ফ্যাক্টরিটির নির্মাণকাল খুব সম্ভবত এই সময়ের মধ্যেই হয়েছিল বলে উলিলখিত তথ্য মতে ধারণা করা যেতে পারে। এখানে আরেকটি বিষয় উলেলখ না করলেই নয়। "The fifth report from the select committee on the affairs of the East India company" Vol-I Bengal presidency নামক গ্রন্থটি লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়েছে ১৮২২ সালে। একই গ্রন্থ মাদ্রাজ থেকে মুদ্রিত হয়েছে ১৮৬৬ সালে। পরবর্তীকালে ইউনাইটেড স্কটিশ প্রেস কর্তৃক পুনঃমুদ্রিত পুস্তকে রয়েছে জনৈক মি. জেমস গ্রান্ট কর্তৃক অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে (২৭/০৪/১৭৮৬) বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেলষণসহ প্রতিবেদন। গ্রন্থটির ২৫৯ ও ২৬০ পৃষ্ঠার তথ্যগুলি গুরচত্বপূর্ণ এখানে তৎকালীন রাজশাহীর বর্ণ না রয়েছে এভাবে'Rajeshahy, the most unwieldy extensive zemindarry of Bengal, or perhaps in India; intersected in its whole length by the great Ganges or lesser branches, with many other navigable rivers and fertilizing waters, Producing within the limits of its jurisdiction, at least four fifths of all the silk, raw or manufactured, used in, or exported from the effeminate luxurious empire of Hindostan, with a super abundance of all the other richest productions of nature and art, to be found in the warmer climates of Asia, fit for commercial purposes; enclosing in its circuit, and benifited by the industry and population of the overgrown capital of Moorshedabad, the principal factories of cossim-bazar, Bauleah, commercolly etc and bordering on almost all the other great provincial cities, manufacturing towns, or public markets of the soubah; was conferred in 1725, being little more than 30 years antecedent to the British conquest, on Ramjeon, a Brahmin".

উপরের বর্ণ নায় স্পষ্টভাবে কয়েকটি বিষয়ের উলেলখ দেখা যায়। প্রথমত, রাজশাহী নামক জমিদারীর বিশালত্ব। দ্বিতীয়ত, এই এলাকার উৎপাদিত বিপুল সিল্কসহ অন্যান্য রপ্তানীযোগ্য পণ্য দ্রব্যাদি। তৃতীয়ত, রাজশাহী একটি শহর হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে পদ্মাতীরে নির্মি ত ফ্যাক্টরি বা কুঠি সংক্রান্ত একটি তথ্য। উক্ত রিপোর্টে বলা হচ্ছে গঙ্গা বা পদ্মা তীরবর্তী প্রধান প্রধান শহর যেমন- কাশিম বাজার, বোয়ালিয়া, কুমারখালীসহ আরও অনেক শহরের ফ্যাক্টরিগুলি রাজশাহীর বিশাল ভূ-

সম্পত্তি রামজীবন নামক একজন ব্রাহ্মণকে ১৭২৫ সালের মধ্যেই অর্পণ করা হয়। পদ্মাতীরের বড়কুঠি নামক ফ্যাক্টরি বা কুঠিটির নির্মাণকাল ১৭২৫ সালের পূর্বে এটি নিশ্চিত হওয়া গেছে এই রিপোর্ট টির মাধ্যমে। বড়কুঠি নির্মাণের সম্ভাব্য সময়কাল খ্রিষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে এই তথ্যটি অনেকটাই নির্ভুল বলা যেতে পারে। কুঠি নির্মাণের পর ওলন্দাজগণ তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি করেছিল। রাজশাহী পূর্বে ছিল মাযার কেন্দ্রিক একটি জনপদ। বড়কুঠি নির্মিত হওয়ার পর শহর হিসেবে বুয়ালিয়ার আত্মপ্রকাশ ঘটার ক্ষেত্রে একটি মাত্রা যোগ হল। রামজীবন পরিপূর্ণ ভাবে রাজশাহীর জমিদারী[৩৯] লাভের পর জমিদারীর রাজধানী হিসেবে নাটোর শহর দ্রত বৃদ্ধি পেতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নাটোর সে সময়কার একটি সুন্দর শহররূপে প্রতিষ্ঠা পেয়ে যায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন-শৃঙ্খলা ও ধর্মীয় কর্মকান্ডসহ নানান বিষয়ে নাগরিকগণ কমবেশী সুযোগ সুবিধা ভোগ করছিলেন। নারোদের তীরে গড়ে উঠা এই শহরের সাথে চলনবিলের নৌ যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত চমৎকার। সে সময়কার মোঘল শাসকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত চাপিলা, সোনাবাজু, হান্ডিয়াল, চাটমোহর- এ সকল প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক শহরগুলোর সঙ্গে নাটোরের সরাসরি যোগাযোগ ছিল। রাজশাহী তখন অবধি শহর হিসেবে গড়ে উঠেনি।

আমরা যদি সপ্তদশ কিম্বা অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি তবে দেখব বর্তমান পদ্মাতীরের রাজশাহী শহরটি কাগজে কলমে শুধুমাত্র 'বোয়ালিয়া' নামেই অভিহিত হয়ে এসেছে। বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ব্যবসা বাণিজ্য করার জন্য ব্যাপকভাবে মানুষজন এসেছেন। বাংলাদেশ ছিল নদী এবং খালবিলে ভরা। বহিরাগত নাবিক, পরিব্রাজক, ব্যবসায়ী, যোদ্ধা, ধর্মযাজক এসকল বিভিন্ন পেশার মানুষেরা বাংলার নৌপথ আবিস্কার করে ব্যবসার সহজ যাতায়াতের পথ খোঁজার উদ্দেশ্য নিয়ে একাধিক মানচিত্র প্রস্তুত করেন। চুঁচুঁড়ার ওলন্দাজ গভর্ণর ভ্যানডেন ব্রক(Vanden Broucke) বাংলার একটি মানচিত্র বা নক্সা অাঁকেন ১৬৬০ খ্রি.। এই নক্সাটিতে সে সময়কার নৌপথের বর্ণনা রয়েছে। নদী তীরের বড় বড় বন্দর ও শহরগুলি এই নক্সায় উলেলখ করা আছে। সেখানে বোয়ালিয়া নামটির উলেলখ রয়েছে। মেজর জেমস রেনেল বৃটিশ নাগরিক। তিনি বাংলাদেশের নদীপথ জরিপ করেছিলেন ১৭৬৪ থেকে ১৭৮১ অবধি। তাঁর প্রস্তুতকৃত মানচিত্রে (১৭৬৪-৭৬) গঙ্গার পার্শ্বে বোয়ালিয়া নামক শহরের অবস্থান নির্দিষ্ট করে দেখানো হয়েছে।

১৭৮৬ সালে বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জেমস গ্রান্টতদানীন্তন গভর্ণর জেনারেলের কাছে চিঠি এবং বাংলার অর্থনৈতিক বিশেলষণসহ তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিবরণ পেশ

করেন যেটি 'An Histroical and comparative analysis of the finances of Bengal' নামে প্রসিদ্ধ। এই রিপোর্টে র একটি অংশেJames Grant রাজশাহী সম্বন্ধে যে সকল বর্ণ না দিয়েছেন সেগুলো ঐতিহাসিক বিচারে বিশেষ ভাবে গুরচত্বপূর্ণ ।১৮১২ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'The First report from the select committee on the affairs of the East India Company' নামক গ্রন্থের ২৫৯ ও ২৬০ পৃষ্ঠায় (পূর্বে উলিলখিত) রাজশাহীর ব্যপ্তি এর সম্পদ, ব্যবসা, বাণিজ্য ইত্যাদি সম্পর্কে আলোকপাত করে 'বোয়ালিয়া'সহ গঙ্গার তীরবর্তী মুর্শি দাবাদ, কাশিমবাজার, কুমারখালী এসকল সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক শহর গুলোর কথা উলেলখ রয়েছে উক্ত রিপোর্টে । রিপোর্টে বোয়ালিয়ার ইংরেজী বানান'Beauleah' উলেলখ রয়েছে।

উলিলখিত তথ্য প্রমাণে দেখা যাচ্ছে, হযরত শাহ মখদুম রূপোশ (রহ.) এর মহাকালগড়ে আগমন এবং যুদ্ধে বিজয় লাভের পর থেকে স্থানটি বোয়ালিয়া নামে সাড়ে পাঁচশত বছর অতিক্রম করেছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমল শেষ হবার ৩০/৩২ বছর পূর্ব থেকে শহর বলতে ব্যাপকভাবে'রামপুর বোয়ালিয়া' নামটি ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৯২৯ সালে রেল লাইনের কাজ শেষ হলে স্টেশনটির নামকরণ করা হয় 'রামপুর বোয়ালিয়া'। তবে এর পর পরই নাম পরিবর্তন করে রাখা হলো রাজসাহী। ১৯৪৭ সালের পর রাজসাহী এর পরিবর্তে হলো রাজশাহী।

নবাব আলীবর্দি খান ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে মারাঠাবর্গীগণ[৪০] বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চলে দস্যুতা লুণ্ঠনসহ নানাবিধ সন্ত্রাসী কর্ম কান্ড শুরচ করে।১৭৪২ সালের পর পরই অব্যাহত বর্গী হামলার কারণে মুর্শি দাবাদ ও এর সন্নিহিত অঞ্চল থেকে হাজার হাজার বিভিন্ন পেশার নাগরিক পদ্মা পাড়ি দিয়ে গোদাগাড়ী, রামপুর বোয়ালিয়া, সারদা ও সন্নিহিত এলাকাসমূহে চলে আসেন।[৪১] এদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম াবলম্বী ভাষা ও পেশার মানুষ ছিলেন। অনেকেই ছিলেন অভিজাত শ্রেণীর। সবচেয়ে গুরচত্বপূর্ণ হচ্ছে এদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন সে আমলের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। বড় ধরনের এই মাইগ্রেশন ছিল রাজশাহী শহর হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে একটি গুরচত্বপূর্ণ মাইলফলক। এ সকল মোহাজেরগণের মুর্শি দাবাদ, বীরভূম, বর্ধ মান এ সকল এলাকা থেকে রাজশাহীতে আসা পলাশীর যুদ্ধে করচণভাবে পরাজয় বরণকারী নবাব সিরাজউদ্দৌলার পক্ষের সিপাহীগণের অনেকেই রাজশাহীসহ বিভিন্ন এলাকায় এসে বসবাস শুরচ করেন। সামান্য কয়েক বছরের ব্যবধানে বোয়ালিয়ার জনসংখ্যা কয়েকগুণ বৃদ্ধি পেল। উলিলখিত মোহাজেরগণের বোয়ালিয়ায় আগমনের পূর্বে এই জনপদের বসতি ছিল বর্তমান দরগাহপাড়াসহ সন্নিহিত সামান্য কিছু এলাকা নিয়ে এবং বড়কুঠিকেন্দ্রিক আশেপাশের অতি অল্প কিছু এলাকায়। তখন অবধি বোয়ালিয়ায় কোন বাজার গড়ে উঠেনি। ডাচগণ বড়কুঠি

নির্মাণের পর এটিকে কেন্দ্র করে শুধু নিজেরাই ব্যবসায় নিয়োজিত ছিল। স্থানীয় কোন ব্যবসায়ী তাদের সাথে যুক্ত ছিল কিনা ইতিহাসে তেমন কোন উলেলখ না থাকলেও স্থানীয় একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিলো- এটিই স্বাভাবিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মুর্শিদাবাদ থেকে উলিলখিত মোহাজেরগণের গ্রেট মাইগ্রেশনের মধ্য দিয়ে বোয়ালিয়াতে রাতারাতি রেশম, নীল, লক্ষ্মা, কার্পাস ও কার্পাস বস্ত্র চিকন চাউল ইত্যাদি পণ্য দ্রব্যের ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠে। আগত মোহাজেরগণের মধ্যে যে সকল ব্যবসায়ী ছিলেন এরা এবং এদের পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কোকারাম মন্ডল, নগেনদাস, ফুল চাঁদ, লালবিহারী, খাঁন সাহেব, খেতুবাবু, কার্তিকসাহা, দুলালসাহা। এ ছাড়াও অনেক ব্যবসায়ী এসেছিলেন উত্তর প্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, গুজরাট এ সকল এলাকা থেকে।[৪২] এদের দ্বারা রেশমকুঠি ও কারখানা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল রেশমপট্টি, সাগরপাড়া, শিরইল, সপুরা, বায়া, এ সকল এলাকায়। নবাগত ব্যবসায়ীগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরচর মধ্যেই নিজেদের অবস্থান মজবুত করতে সক্ষম হন। এদের ব্যবসায়িক সফলতার কারণে বোয়ালিয়া কয়েক হাজার তাঁতীর আবাসস্থল রূপে পরিচিতি পেল।[৪৩] বিভিন্ন পেশা ও গোত্রের মানুষ শহরের পশ্চিমে নিজ নিজ আবাসস্থল গড়ে তুললেন। নিজেদের পেশার সাথে এবং গোত্রের নামের সাথে মহললার নামকরণ হয়ে গেল। যেমন- পাঠানপাড়া, সিপাইপাড়া, শেখপাড়া, কাজীহাটা, কাজীরগঞ্জ, খানসামারচক, হোসেনীগঞ্জ, হাতেম খাঁন ইত্যাদি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝ থেকে শুরচ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যেই বোয়ালিয়া শহর হিসেবে গড়ে উঠার প্রাথমিক অবস্থানটি মজবুত করে ফেলে। এই সময়কাল পর্যন্ত জনপদটির শাসন ব্যবস্থা কিংবা প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ কিভাবে পরিচালিত হতো এর কোন লিখিত দলিল নেই। ইতিহাস পর্যালোচনা করে যতদূর জানা যায়, সুলতানী আমল বা মোঘল আমলের সৃষ্ট কোন প্রশাসনিক কেন্দ্র বোয়ালিয়ায় ছিল না। সুলতানী আমলে প্রশাসনিক এবং সামরিক কেন্দ্র ছিল পদ্মা তীরবর্তী আলাইপুর এবং হোজা নদী তীরবর্তী দমদমা (পুঠিয়া) নামক স্থানে। মোঘলদের সময়ে আলাইপুর এবং চাপিলায় মোঘল ফৌজদার থাকতেন।[৪৪] এ জাতীয় কোন ধরনের প্রশাসনিক কেন্দ্র বোয়ালিয়া ছিল না। নবাবী আমল কিংবা কোম্পানি আমলেও বোয়ালিয়ায় কোন ধরনের প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল না। সুলতানী ও মোঘল আমলে গড়ে উঠা শহর তাহিরপুর ও পুঠিয়ায় নিরাপত্তাসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা ও ধর্মীয় কর্মকান্ড সম্পাদনের জন্য স্ব স্ব রাজা ও জমিদারগণ প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্ব নিতেন। শহরের শান্তি শৃঙ্খলার বিষয়টিও তাঁদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিন্তু বোয়ালিয়াতে এ ধরনের কোন কর্তৃপক্ষ নবাবী কিংবা কোম্পানি আমলে ছিল বলে জানা যায় না। কাজেই নবাবী আমলের শেষে এবং কোম্পানী আমলের প্রথম দিক থেকে বোয়ালিয়া একটি দ্রচত বর্দ্ধনশীল শিল্প কারখানার শহর হিসেবে বেড়ে উঠতে শুরচ

করলেও প্রকৃতপক্ষে এই শহরটির শাসনকার্য পরিচালনার জন্য নির্দি ষ্ট কোন কর্তৃপক্ষ না থাকায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আইনশৃঙ্খলার বিষয়গুলো ছিল অনুপস্থিত। সেই বিবেচনায় বোয়ালিয়াকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক অবধি পুর্ণ াঙ্গ শহর হিসেবে আখ্যা দেয়া সঠিক হবে বলে মনে হ্ম না। যদিও এই সময়কালের মধ্যে বোয়ালিয়ায় বসবাসরত জনসংখ্যা ছিল দশ হাজারেরও অধিক।[৪৫]

আমরা জানি, শহর বা নগর সৃষ্টি হয় কতগুলি প্রাকৃতিক অবস্থা ও ভৌত অবকাঠামোকে কেন্দ্র করে। এগুলির মধ্যে প্রধান যে তিনটি বিষয় উপাদান হিসেবে কাজ করে এর মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে তীর্থ ভূমি। প্রাচীন মিশরে থিবস নগর গড়ে উঠেছিল মন্দিরকে কেন্দ্র করে। আরব দেশে মক্কা, মদিনা, জেরচজালেম, বেথেলহেম এবং ভারতবর্ষে গয়া কাশী, কামরূপ, তিরূপতি, অমৃতসর, আজমীর এই শহরগুলো তীর্থ ভূমিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। শহর গড়ে উঠার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থা। পৃথিবীতে নদী ও সমুদ্রের ধারে বেশির ভাগ শহর ও নগর গড়ে উঠেছে। লন্ডন, নিউইয়র্ক, প্যারিস, ঢাকা, কলকাতা, করাচি, মুম্বাই, সাংহাই এ জাতীয় শহরগুলি নদী ও সমুদ্রের তীরে গড়ে উঠেছে। এছাড়া স্থলপথের এবং রেলপথের ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থার উপর নির্ভ র করেও গড়ে উঠেছে অনেক শহর। শহর সৃষ্টির ব্যাপারে তৃতীয় যে কারণটি কাজ করে সেটি হচ্ছে প্রশাসনিক কেন্দ্র। এর মধ্যে সামরিক কর্ম কান্ডের জন্য নির্মি ত ঘাঁটিও অন্যতম।

প্রথম অবস্থায় মন্দির ও মাযার শরীফকে কেন্দ্র করে বুয়ালিয়া নামক জনপদ গড়ে উঠেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্য ন্ত এই জনপদটি তীর্থক্ষেত্র হিসেবে পরিচিতি পেয়েছিল। এরপর পদ্মার তীরে বড়কুঠি নামক ডাচ ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা পাওয়ার পর বুয়ালিয়া ছোট নৌবন্দর হিসেবে মানচিত্রে স্থান পেয়েছে। এরপর অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মুর্শি দাবাদ এলাকা থেকে হাজার হাজার মোহাজের রাজশাহীতে এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। এদের মধ্যে উলেলখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তি ছিলেন ব্যবসায়ী। বুয়ালিয়া শহর হিসেবে ভিত্তি পেয়েছে সেই সময় থেকেই। একটি পরিসংখ্যানে দেখা যায়, ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে গোটা বিশ্বে পাঁচ হাজার বা তারও বেশী জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহর ও নগরের সংখ্যা ছিল ৭৫০টি।[৪৬] সে সময়কার রামপুর বোয়ালিয়া নিশ্চিতভাবে এই শ্রেণীর অন্তর্ভূ ক্ত ছিল। তবে যেহেতু শহরটির প্রশাসনিক কাঠামো কিংবা নির্দি ষ্ট কোন নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ ছিল না এবং শহর বা নগরের পূর্ণ াঙ্গ বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকায় বোয়ালিয়াকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশক অবধি ষোলআনা শহর বলার কোন যৌক্তিক কারণ নেই। উলিলখিত ডাচ, ফরাসি, ইংরেজ এ সকল ইউরোপীয় ব্যবসায়ী এবং মুর্শি দাবাদ্ বিহার, উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট এ সকল এলাকা থেকে আগত ব্যবসায়ীগণের ব্যাপক বাণিজ্যিক কর্ম কান্ডের ফল হচ্ছে আজকের রাজশাহী শহরের ভিত্তি।

উলিলখিত ব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণ করতে গিয়ে শহরেরও সম্প্রসারণ ঘটিয়েছেন। লোকসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। যতদূর জানা যায়, এরা সুচিন্তিতভাবে ও পরিকল্পনার মাধ্যমে শহরের উন্নতির বিষয়ে কার্য কর কোন ভূমিকা গ্রহণ করেননি। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ব্যবসার উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির বিষয়ে সচেষ্ট ছিলেন। যে কারণে বুয়ালিয়া নামক শহরটি লক্ষ্যহীন এবং অপরিকল্পিত অবস্থার মধ্য দিয়ে গড়ে উঠতে থাকে। এই গুরচত্বপূর্ণ সময়টিতে মুর্শিদাবাদের নবাবের কোন প্রতিনিধি কিংবা পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কোন প্রশাসক এই শহরে নিয়োজিত ছিলেন না। রাজশাহী জমিদারীর রাজধানী নাটোর ছিল সে সময়ে পূর্ণাঙ্গ একটি শহর। সেখানে থানা, দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত, জেলখানা, স্কুল, মাদরাসা ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল। রাজা নিজেই সরাসরি তার কর্মচারী কর্মকর্তাদের মাধ্যমে প্রশাসন পরিচালনা করতেন। মানুষ ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সে আমলে নাটোরে এসে লেখাপড়া শিখতেন, প্রশাসনে চাকুরী পাবার আশায় অনেকেই নাটোরে এসে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করে পরবর্তীকালে বিশাল জমিদারীর মালিক হয়েছিলেন। এদের মধ্যে পাবনার তাঁতিবন্দ এবং দুলাই এলাকার জমিদারগণ অন্যতম।

উইলিয়াম উইলসন হান্টার (W.W. Hunter) ছিলেন বৃটিশ ভারতে পরিসংখ্যান সংক্রান্ত দপ্তরের মহাপরিচালক। ১৮৭৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর লেখা "A statistical account of Bengal, Vol-VIII, District of Rajshahi" নামক গ্রন্থে রামপুর বোয়ালিয়া শহর সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্য দিয়েছেন-

"The town is a large and important centre of commerce; and the collector states that it was first selected by the Dutch in the early part of the last century as the seat of a factory. Subsequently, it was for many years the headquarters of an English commerical resident; and on the abolition of these appointements, the residency was purchased as a factory by the wealthy firm of Watson and company. In 1825 the seat of administration of the District was removed from Nator to Rampur Beauleah, in consequence of the unhealthiness of the former town; and this circumstance, combined with the advantageous commercial position of Beauleah on the banks of the Ganges, has made it the largest and most important place in the District. The town itself dates from a recent periord, and it built for the most part on river alluvion. The fact that none

of the ancient families of the District reside here, sufficiently indicates its recent origin."

উপরের বর্ণনায় বেশ কয়েকটি বিষয় স্পষ্টভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এক, শহর হিসেবে রাজশাহী অত্যন্ত নবীন। দুই, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ডাচদের দ্বারা নির্মিত ফ্যাক্টরিকে (বড়কুঠি) কেন্দ্র করে শহরটি বড় একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। তিন, যেহেতু শহরটির সৃষ্টি খুব বেশী দিনের নয়, সে কারণে এই জেলার আদি এবং প্রাচীন বংশের কেউ (রাজা বা জমিদারগণ) এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন না। মোট কথা শহরটি যে প্রাচীন নয় এই সত্যটিই হান্টার সাহেবের বর্ণনায় উঠে এসেছে।

জেলা হিসেবে রাজশাহী এবং শহর হিসেবে বুয়ালিয়া এই নাম দুটি নিয়ে গবেষণা, বিশেলষণ ইত্যাদি হয়ে আসছে বহুকাল পূর্ব থেকেই। এসকল গবেষণার সূত্র ধরে আলোচনা চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।

প্রথমত, রাজশাহী নামকরণ নিয়ে সামান্য আলোচনা হতে পারে। রাজশাহী নামকরণের পটভূমি সম্পর্কে একাধিক ঐতিহাসিক তাঁদের মতামত রেখেছেন। এদের মধ্যে ঐতিহাসিক বেভারিজ, কালীপ্রসন্ন শর্মা, শ্রী কালীনাথ চৌধুরী, কাজী মোহাম্মদ মিছের, প্রফেসর এবনে গোলাম সামাদ এবং ড. কাজী মো: মোস্তাফিজুর রহমান প্রমুখ উলেলখযোগ্য।

বর্তমানে রাজশাহী বলতে রাজশাহী জেলা, রাজশাহী বিভাগ এবং মহানগর রাজশাহীকেই বুঝানো হয়। ১৯৪৭ সালের পূর্বে কিংবা তারও অনেক পূর্বে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শুরচতে ঠিক এমনটি ছিল না। রাজশাহী নামটি সপ্তাদশ শতাব্দীতে শোনা যায়নি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরচতে সর্বপ্রথম নামটির সাথে আমরা পরিচিত হই। এই পরিচয়ের সূত্রটির একটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট রয়েছে।

সম্রাট আকবরের রাজস্ব সচিব খাজা মোজাফ্ফর[৪৭] এবং রাজা টোডরমলের[৪৮] তৈরি বাংলার রাজস্ব বন্দোবস্তের[৪৯] জন্য বাংলাকে মোট ১৯টি সরকারে ভাগ করা হয়। অর্থাৎ মোঘল রাজস্ব তালিকায় মোট ১৯টি সরকারের সমন্বয়ে খাসবাংলা গঠিত ছিল। এগুলো হচ্ছে, সরকার লখনৌতি বা জান্নাতাবাদ (গৌড়), সরকার পূর্নিয়া সরকার তাজপুর বা তেজপুর, সরকার পিঞ্জেরা বা পাঞ্জেরা, সরকার ঘোড়াঘাট, সরকার বারবাকাবাদ (রাজশাহীর কিছু অংশ এই সরকারের অন্তর্ভূক্ত), সরকার বাজুহা (রাজশাহীর কিছু অংশ রয়েছে এই সরকারে), সরকার সিলহট বা সিলেট, সরকার সোনারগাঁও,

সরকার চাটগাম বা চাটগাঁও, সরকার সাতগাঁও, সরকার মাহমুদাবাদ, সরকার খলিফাতাবাদ বা খলিফাআবাদ, সরকার ফতেহাবাদ, সরকার বাক্লা (বোগলা), সরকার টান্ডা বা উদনার, সরকার শরিফাবাদ, সরকার সুলায়মানাবাদ বা সলিমনাবাদ এবং সরকার মান্দারন। মোট ১৯টি সরকার ৬৮২টি পরগনায় বিভক্ত ছিল। এগুলির বাৎসরিক মোট রাজস্ব জমা নির্ধারিত ছিল(১৫৮২ সাল এবং এর পূর্বে ও) ১৫,৬৮৫,৯৪৪ টাকা। এই রাজস্ব প্রজাদের জমির উৎপাদিত ফসলের মূল্যের এক ষষ্ঠমাংশ আদায় করা হতো (আইন-ই-আকবরী, ২য় খন্ড, ৫৫ ও ৬৩ পৃষ্ঠা)।

এরপর শাহজাদা সুজা বাংলার গভর্নর হিসাবে(সুবাদার) নিয়োগ পেলে তিনি ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে নতুন একটি রাজস্ব তালিকা তৈরি করালেন। তার প্রস্তুতকৃত তালিকায় বাংলা ৩৪টি সরকার এবং ১৩৫০ মহালে বিভক্ত হলো (এসময়ে বাংলার আয়তন বৃদ্ধি হয়েছিল এবং উড়িষ্যার জলেশ্বর অঞ্চল সরকারে অন্তর্ভূক্ত করা হয়। তার সময় খালশা এবং জায়গীর উভয় খাত থেকে মোট রাজস্ব ১,৩১,১৫,৯০৭ নির্ধারিত ছিল। এখানে উলেলখ করা প্রয়োজন মোঘল আমলে বাংলাকে বিভিন্ন সরকারে বিভক্ত করা হয়েছিল। আসলে এই সরকারগুলি হচ্ছে বর্তমানকালের জেলার পূর্বতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা। তবে এর মূল কর্মকান্ড ছিল যতটা না উন্নয়নমুখি তার চেয়েও বেশি ছিল রাজস্ব আদায়ের দিকে। এই রাজস্ব কর ছিল দুই শ্রেণীর। প্রথমটি হচ্ছে বাংলাদেশের ভূমির কিয়দাংশের কর কর্মচারীগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এসকল ভূমি জায়গীর নামে অভিহিত ছিল। দ্বিতীয়টি ভূমির কর যা রাজকোষে প্রেরিত হত। এর নাম খালসা বা খালেসা ভূমি।

মুর্শিদকুলী খান ১৭০১ সালে বাংলা এবং উড়িষ্যার দেওয়ান পদে আসীন হলেন। এরপর প্রায় ২১ বৎসর অত্যন্ত যত্ন এবং পরিশ্রম করে বাংলার নতুন রাজস্ব বন্দোবস্তের কাজ সমাপ্ত করলেন। ১৭২২ সালে এটি কার্যকর হল। বাংলার তৃতীয় রাজস্ব বন্দোবস্তের আওতায় মুর্শিদকুলী খাঁন সমগ্রবঙ্গকে মোট তেরটি বিভাগে বিভক্ত করলেন। বিভাগগুলোর নাম দিলেন চাক্লা।[৫০] এই তেরটি বিভাগ মোট ১৬৬০টি পরগনায় বিভক্ত হলো। শুধু তাই নয়- মুর্শিদকুলী খান ১৩ চাকলার মধ্যে ২৫টি জমিদারী বিভাগের (এহিতমাম বন্দী) বন্দোবস্ত চালু করেন। উপরোক্ত ১৩টি চাক্লা এবং ২৫টি জমিদারী বন্দোবস্তের যে কাগজ প্রস্তুত হল এর নাম 'জমা কামেল তুমারী'। ভূমি সংক্রান্ত এই পাকা বন্দোবস্তই পরবর্তীকালের বন্দোবস্ত সমূহের ভিত্তি। মুর্শিদকুলী খানের সৃষ্ট নতুন ১৩টি বিভাগ বা চাক্লা গুলি হচ্ছে : মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান, সপ্তগ্রাম বা হুগলী, যশোহর, ভূষণা, আকবরনগর (রাজমহল), ঘোড়াঘাট, কারীবাড়ী (আসামের কাছাকাছি), জাহাঙ্গীরনগর (ঢাকা), শ্রীহট্ট, ইসলামাবাদ (চট্টগ্রাম)। এছাড়া তিনি

উড়িষ্যা থেকে বন্দর বলেশ্বর এবং হিজ্লী কেটে এনে বাংলার সাথে যুক্ত করলে ১৩টি চাক্লা দাঁড়িয়ে যায়।

২৫টি জমিদারী বিভাগ বা এহতিমাম বন্দোবস্তের প্রথমটি হচ্ছে বর্দ্ধমান। দ্বিতীয় জমিদারীর নামকরণ করা হলো রাজশাহী। এই প্রথম ইতিহাসে রাজশাহীর নাম এসে গেল। এভাবেই নিশ্চিত হওয়া গেল যে, ১৭২২ খ্রিস্টাব্দে প্রথম রাজশাহীর নামটি সরকারিভাবে স্থায়ী রূপ পেল। মুর্শিদকুলী খাঁর সৃষ্ট বাংলায় ২৫টি জমিদারী বিভাগ যেটি সরকারি ভাষায় 'এহতিমাম বন্দী' বন্দোবস্ত সেখানে রাজশাহী জমিদারী স্থান পেল স্থায়ীভাবে। প্রথমত, মুর্শিদকুলী খান বাংলায় মোট ১৩টি বিভাগ বা চাক্লা সৃষ্টি করেন যার নাম উলেলখ করা হয়েছে। এতে রাজশাহী নামের কোন চাক্লা নেই। তাহলে এতকাল আমরা বিভিন্ন গ্রন্থে উলেলখ পাচ্ছি নিজ চাক্লা রাজশাহী এই নামটি। এটি হল কেন? নিজ চাক্লা রাজশাহী নামটি এসেছে ডাবিলউ ডাবিলউ হান্টারের লিখিত Statistical Account of the District of Rajshahi গ্রন্থের ২০ পৃষ্ঠায়। এই পুস্তকটি ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত। হান্টার 'নিজ চাক্লা রাজশাহী' এই কথাটি পেয়েছেন ওয়াল্টার কেলী ফারমিঞ্জাঁর সম্পাদিত (Walter Kelly Firminger) "The fifth report from the select committee of the house of commons on the Affairs of the East India Company" 28th July 1812 (সম্পাদনা করেছেন ১৯১৭ সালে) নামক পুস্তকের ২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণি ত অংশ থেকে। সেখানেফারমিঞ্জাঁর এভাবে বলেছেন : "In the year 1728 the Zamindari of Rajshahi extended from Bhagalpur on the west to Dacca on the East and included a large sub division called Nil Chakla Rajshahi, which stretched accross Murshidabad and Nadia as far as the frontiers of Birbhum and Burdwan. Rajshahi thus comprised an area of 13,000 square miles, and paid a revenue of 27 Lakhs."

ফারমিঞ্জাঁর ছিলেন কলকাতা হিস্টরিক্যাল সোসাইটির সভাপতি। 'বেঙ্গল পাস্ট এ্যান্ড প্রেজেন্ট' নামে বহু খন্ডে প্রকাশিত আকর ইংরেজী ইতিহাস গ্রন্থের তিনি সম্পাদনা করেছেন।

বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেরেস্তাদার মি: জেমস গ্রান্ট (Mr. James Grant) ১৭৮৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল তার বিখ্যাত রাজস্ব বিবরণী (An Historical and Comparative Analysis of the Finances of Bengal) পেশ করেন। জেমস গ্রান্ট-র রাজস্ব বিবরণী,

বাংলার ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত স্যার জন শোর কর্তৃক প্রস্তুতকৃত কার্য বিবরণী(Mr. Shore's Minute 18th June 1789), মি: জন শোর এর দ্বিতীয় কার্য বিবরণী (চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সংক্রান্ত), কানুনগোগণের কর্তব্য সম্পর্কে ভাগলপুরের কালেক্টর কর্তৃক লিখিত পত্র (৬ ডিসেম্বর ১৭৮৭ এবং ১১ আগস্ট ১৭৯০), বোর্ড অব রেভিনিউ এর কার্য বিবরণী১৪ মার্চ ১৭৯৪ (জমিদার কর্তৃক রায়তদের নিকট থেকে কর আদায়ে সমস্যা সংক্রান্ত), সার্কিট জাজগণের রিপোর্ট (মি: এইচ স্ট্রেচীর রিপোর্ট, ২৪ মার্চ ১৮০৩) ইত্যাদি নানা ধরনের প্রশাসনিক গুরচত্বপূর্ণ বিষয় সম্বলিত তথ্য একত্র করে ১৮১২ সালে লন্ডন থেকে একটি রিপোর্ট পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এটি 'The Fifth Report' নামে পরিচিত। এখানে মূলত বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কার্য াবলী, মোঘল এবং নবাবী আমলে বাংলাসহ ভারতবর্ষে র অন্যান্য কয়েকটি অঞ্চলে ভূমি রাজস্বসহসংশিলষ্ট বিষয়ের উপর বর্ণ না করা হয়েছে। পাশাপাশি কোম্পানির পরবর্তী কার্য ক্রম কি হবে ইত্যাদি বিষয়েও আলোকপাত করা হয়েছে পুস্তকটিতে। সমূদয় রিপোর্ট বৃটিশ পার্ল ামেন্টে(হাউস অব কমন্স) আলোচনা হয়েছে। এই গুরচত্বপূর্ণ তথ্যবহুল গ্রন্থটির(The fifth Report) ২২১ পৃষ্ঠা থেকে ৫৫৪ পৃষ্ঠা অবধি মি: জেমস গ্রান্টের বাংলার ভূমি রাজস্ব ও অর্থ নৈতিক বিশেলষণের বিবরণ রয়েছে। সবচেয়ে গুরচত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে উক্ত রিপোর্টে র রাজশাহী অংশে। পুস্তকটির২৫৯ ও ২৬০ পৃষ্ঠায় পরিষ্কারভাবে উলেলখ রয়েছে, নবাব মুর্শি দকুলী খান প্রবর্তিত বাংলার মোট২৫টি জমিদারীর একসনা বন্দোবস্তের বিষয়টি। এর নাম এহতিমামবন্দী বা এহতিমাম বন্দোবস্ত। উক্ত গ্রন্থের ২৫৯ পৃষ্ঠা থেকে ২৬৮ পৃষ্ঠা অবধি বাংলার ২৫টি বৃহৎ জমিদারির উলেলখ রয়েছে। অর্থ াৎ নবাব সরকারের ভাষায় এহতিমাম বন্দোবস্তের বিষয়ে পরিষ্কারভাবে আলোচিত হয়েছে। উক্ত ২৫টি জমিদারির দ্বিতীয়টি হচ্ছে রাজশাহী জমিদারি।

এখন আমাদের আলোচনা করতে হবে, নবাব মুর্শি দকুলী খানের নিকট থেকে রঘুনন্দন কখন এবং কোন কোন জমিাদারী প্রাপ্ত হলেন। প্রাপ্ত এসকল জমিদারির কি কি নাম ছিল ইত্যাদি। কারণ, এর মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসবে রাজশাহী জমিদারির নাম এবং প্রকৃত কোন সময়ে রাজশাহী নামের সৃষ্টি হয়েছিল।

আমাদের জানা রয়েছে, রাজশাহীর প্রাচীন জমিদারি হচ্ছে লস্করপুর বা পুঠিয়া। এই জমিদারীতে তহশিলদার হিসেবে কাজ করতেন কামদেব। কামদেবের পুত্র রঘুনন্দন নাটোর বা রাজশাহীর জমিদারীর প্রতিষ্ঠাতা। তিনিও পুঠিয়ার জমিদারি সেরেস্তায় কিছু দিন কাজ করেছেন। নিজ কর্ম গুণে রঘুনন্দন মুর্শি দাবাদ নবাব দপ্তরের প্রধান কানুনগো দর্প নারায়ণের দেওয়ান বা নায়েবকানুনগো পদ

লাভ করেন।[৫১] নবাব মুর্শিদকুলী খান এসময়ে প্রতিভাসম্পন্ন বেশ কয়েকজন রাজস্ব ও ভূমি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ দ্বারা বাংলার নতুন ভূমি বন্দোবস্তের নিয়ম কানুন প্রস্তুত করেছিলেন। মুর্শিদকুলী খানের আমলে পরগনা বানগাছীর চৌধুরী গনেশরাম ও ভগবতী চরণ রাজস্ব প্রদানে শৈথিল্য প্রদর্শন এবং শেষে রাজস্ব খেলাপী হওয়ায় উক্ত জমিদারি বাজেয়াপ্ত হয়ে যায়। রঘুনন্দন তার উচ্চ পদের সুযোগ গ্রহণ করে উক্ত জমিদারি তার ভাই রামজীবনের নামে পত্তন করেন এবং কৌশলে দখল করতে সক্ষম হন। এই ঘটনার কাল ১৭০৬ খ্রিষ্টাব্দ, বাংলা ১১১৩। এটি প্রথম জমিদারী প্রাপ্তি।[৫২]

দ্বিতীয় ঘটনা বাংলা ১১১৭ সন অর্থাৎ ১৭১০ খ্রিস্টাব্দ। এই সময় প্রাচীন পরগনা ভাতুরিয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার রামকৃষ্ণের পত্নী রানী সর্বাণী দেবীর মৃত্যু হলে বিস্তীর্ণ জমিদারীর কার্যভার গ্রহণ করেন রঘুনন্দন। এরপর নিজ পদের সুযোগ গ্রহণ করে ১৭১১ খ্রিস্টাব্দে ভ্রাতা রামজীবন ও তার পুত্র কালিকা প্রসাদ ওরফে কালু কাঙরের নামে বন্দোবস্ত নিতে সক্ষম হলেন।[৫৩]

তৃতীয় ঘটনাটি সর্বাধিক গুরচত্বপূর্ণ। অষ্টাদশ শতাব্দীর এক্কোরে শুরচতে উদয় নারায়ণ নামে একজন জমিদার মুর্শিদকুলী খানের আনুকূল্যে জমিদারি ভোগ করছিলেন। কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় (কালীপ্রসন্ন শর্মা) প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' (প্রথম সংস্করণ ১৩০৮ এবং দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৫) গ্রন্থের ৮০, ৮১ পৃষ্ঠায় এবং উক্ত গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের ৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠায় রাজশাহী এবং উদয় নারায়ণের জমিদারি সম্পর্কে উলেলখ রয়েছে। উক্ত পুস্তকের সূত্র মতে, বর্তমান মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে সাঁওতাল পরগনায় পাকুড় মহকুমার একটি অংশ রাজশাহী পরগনা নামে পরিচিত ছিল। এলাকাটি রাজমহলের সোজা পশ্চিমে (বর্তমানে এই এলাকাটি ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত এবং গঙ্গা নদী থেকে খুব বেশী দূরে নয়)। উদয় নারায়ণের পূর্ব পুরচষগন ভারতের পশ্চিমাঞ্চল থেকে আগত লালা কায়স্থ বংশীয় (মারোয়াড়ী) ছিলেন। এই বংশের জনৈক লালা রামগোবিন্দ নবাব আজিমুশ্মানের (১৬৯৭-১৭১২) নিকট থেকে উক্ত রাজশাহী পরগনার জমিদারী পেয়েছিলেন। লালা রাম গোবিন্দের পরবর্তী বংশধর উদয় নারায়ণ। সাঁওতাল পরগনার এই অংশের সামাজিক অবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা ভাল ছিল না। সুবা বাংলার এই সীমান্তে অহরহ সাঁওতাল, ধাঙ্গড়, চুয়ার এসকল উপজাতিদের হামলা, আক্রমণ ইত্যাদির কারণে রাজস্ব আদায়ে ব্যতয় ঘটতো। উদয় নারায়ণ ছিলেন দক্ষ, সাহসী এবং সর্বোপরি কুশলী। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁন উদয় নারায়ণের কর্মদক্ষতায় প্রীত হয়ে আশেপাশের বেশ কিছু ভূসম্পত্তির ব্যবস্থাপনাসহ রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব তার উপর অর্পণ করেন। বন্দোবস্ত আদায় কাজের সহায়তার জন্য গোলাম মোহাম্মদ ও কালু জমাদার নামক দুইজন নবাব বাহিনীর সৈনিকের অধীনে দুইশত অশ্বারোহী সৈন্য উদয় নারায়ণের নিকট প্রেরণ

করেন। এসকল অতিরিক্ত সুবিধা প্রাপ্তির পর উদয় নারায়ণের মনে ভিন্ন ইচ্ছা জাগ্রত হয়। তিনি নবাব প্রেরিত দুইজন সৈনিককে বিভিন্ন প্রলোভনে বশীভূত করলেন এবং নিজ এলাকায় গড় দূর্গ ইত্যাদি নির্মিত করে একজন স্বাধীন সামন্তের ন্যায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রত্যয়ী হলেন। নবাব কোষাগারে রাজস্ব প্রদান বন্ধ হল। যথাসময়ে বিষয়টি নবাবের কর্ণ গোচরে আসলে তিনি শক্তিশালী বাহিনী প্রেরণ করলেন। উদয় নারায়ণের এলাকায় বীরকিটি নামক স্থানের যুদ্ধে গোলাম মোহাম্মদ নিহত হলেন। উদয় নারায়ণকে পলাতক অবস্থায় রঘুনন্দন গ্রেপ্তার করে নবাবের দরবারে হাজির করলেন। উদয় নারায়ণকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করা হলো। মতান্তরে উদয় নারায়ণ আত্মহত্যা করেন। যাই হোক না কেন- উদয় নারায়ণের বিরচদ্ধে পরিচালিত সফল অভিযানের পুরষ্কার স্বরূপ রঘুনন্দন উদয় নারায়ণের রাজশাহী পরগনাসহ পার্শ্ববর্তী সুলতানাবাদ পরগনার সনন্দও পেয়েছিলেন যৌথভাবে। এই ঘটনাটির সময় ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দ। কাজেই একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, রাজশাহী বলতে এখন যে ভূখন্ডটিকে বুঝায় এটি ১৭১৩ খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে রঘুনন্দনের কৃতিত্বে এবং তার ভাই রামজীবন কর্তৃক প্রাপ্ত সনন্দের মধ্য দিয়ে।[৫৪]

জমিদার উদয় নারায়ণের জমিদারি এলাকাটিকে ফারমিঙ্গার সম্পাদিত (১৯১৭ খ্রি:) দি ফিফথ রিপোর্ট নামক গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠায় 'নিজ চাক্লা রাজশাহী' (Nil Chakla Rajshahi) নামে আখ্যায়িত করেছেন। এখানে Nij না হয়ে উলেলখ রয়েছে Nil। হয়তো মূদ্রণযন্ত্রের ত্রচটির কারণে হয়েছে। এখান থেকেই গন্ডগোলের সূত্রপাত। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকগনের অনেকেই Fifth Report এর Nil Chakla বা Nij Chakla এই বাক্যের উপর ভিত্তি করে রাজশাহীকে চাক্লার অন্তর্ভূক্ত করার প্রয়াসী হয়েছেন। আসলে চাক্লা রাজশাহী নামে কোন কালেই প্রশাসনিক ও রাজস্ব বিভাগ ছিল না। ১৮১২ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন থেকে এবং ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত Fifth report নামক পুস্তকের ৩৮৯ পৃষ্ঠায় 'চাকলা' সম্পর্কে বাখ্যা রয়েছে এরকম : ''CHUCKLAH- The whole soubah of Bengal was distributed by Jaffier khan, into 13 of these laerger territorial sub-divisions, which were compact, well and permanently ascertaind in boundary, regularly assessed for the standard crown rent, and each under the separate administration of a faujdar, aumildar, or intendant of finance. The zemindarry of Rajeshahy, came within eight of these jurisdictions."

রঘুনন্দন পরাজিত উদয় নারায়ণের পরগনা (জমিদারী) সহ গঙ্গা বা পদ্মার পশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিমে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার বেশ কিছু অঞ্চলের সনন্দ নিজ ভাই রামজীবনের এবং ভ্রাতুষ্পুত্র কালিকা প্রসাদ ওরফে কালু কঙরের নামে অন্তর্ভূক্ত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ভূষণার জমিদার সীতারাম বিদ্রোহী হলে মুর্শিদকুলী খান তাকে কঠোর হাতে দমন করে মৃত্যুদন্ড প্রদান করলে তার জমিদারি বাজেয়াপ্ত হয়। এই জমিদারির সিংহাভাগ রামজীবন ও তার পুত্র কালিকা প্রসাদ ওরফে কালু কোঙারের নামে পত্তন হয় ১৭১৪ সালের পরপরেই। উদয় নারায়নের পরগনা এবং এর সাথে মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার প্রাপ্ত অংশকে নিজ চাক্লা রাজশাহী বলতে প্রয়াশী হয়েছেন অনেক ঐতিহাসিক। আসলে রাজশাহী নামের সাথে চাক্লা শব্দটির কোন সম্পর্ক নেই। মুর্শিদকুলী খান সুবা বাংলাকে যে ১৩টি চাক্লায় বা প্রশাসনিক/রাজস্ব বিভাগে বিভক্ত করেছিলেন (বিস্তারিতভাবে ইতোপূর্বে বর্ণিত)এর মধ্যে চাক্লা রাজশাহী নামের কোন উলেলখ নেই। রঘুনন্দনের মাধ্যমে বাংলার একটি বিরাট ভূখন্ড ক্রমান্বয়ে যখন বড় ধরনের জমিদারিতে পরিণত হলো, সেটিই আসলে রাজশাহী জমিদারি। এই জমিদারির সদর দপ্তর বা রাজধানী হচ্ছে নারদ নদ তীরবর্তী নাটোর।

'বাঙ্গলার ইতিহাসে' (পূর্বে উক্ত) উলিলখিত প্রাচীন রাজশাহী নামক পরগনার অস্তিত্ব হয়তো ছিল। সেটি ভিন্ন আলোচনা। আমাদের আলোচ্য রাজশাহী অর্থাৎ বর্তমানকালে যে ভূখন্ডটিকে আমরা রাজশাহী বলে জানি- এই নামটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক।

এই অভিমত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বিভারীজ সাহেবের (Henry Beveridge, 1837-1929)। সম্রাট আকবরের সভার অন্যতম পন্ডিত প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ আবুল ফজল আললামীর লিখিত (১৫৯৮) আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে 'রাজশাহী' নামের কোন উলেলখ নেই। তবে পারসী ভাষায় লিখিত উক্ত গ্রন্থটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেন এইচ. বলখম্যান ১৮৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের (১৯২৭) ৬৮৮ পাতার একটি অংশে রাজশাহী প্রসঙ্গ রয়েছে। এটি অবশ্য ফুটনোট। বর্তমান পাবনা জেলাধীন চাটমোহর এলাকার শাসনকর্তা ছিলেন মাসুম খান কাবুলী। সেখানে তিনি ১৫৮১ খ্রিষ্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদে একটি প্রস্তরফলক ছিল। যেটি বর্তমানে বরেন্দ্র জাদুঘর রাজশাহীতে রক্ষিত। এটি দিঘাপতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়, বাবু রাজেন্দ্র নাথ মৈত্রের মাধ্যমে এইচ বলখম্যানের কাছে পাঠিয়েছিলেন। এভাবেই রাজশাহী প্রসঙ্গটি এসেছে। (প্রমথ নাথ রায়কে রাজশাহীর দিঘাপতিয়ার রাজা বলা হয়েছে)। যাহোক রাজশাহী নামকরণের ইতিহাস আলোচনায় স্পষ্ট হয়েছে যে, রাজশাহী নামে কোন চাক্লা নেই। নবাব মুর্শিদকুলী খাঁন রাজস্ব আদায়ের স্বার্থে সুবা বাংলাকে ২৫টি জমিদারিতে বিভক্ত করে একেকজন জমিদারকে একসনা বন্দোবস্ত দিয়েছিলেন যে

‘এহতিমাম’ নামে পরিচিত। মুর্শিদকুলী খানের পরবর্তী নবাব সুজাউদ্দীনের সময়ে ১৭২৮ সালে এই বন্দোবস্ত স্থায়ীরূপ লাভ করে। ২৫টি জমিদারির নাম উলেলখ করে ‘বুয়ালিয়া’ নামকরণের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করব।

বাংলার এহতিমাম বন্দী জমিদারিসমূহ- বর্দ্ধমান, রাজশাহী, নবদ্বীপ বা কৃষ্ণনগর, দিনাজপুর (হাভেলী সরকার পিঞ্জরা), রচকনপুর, বীরভূম, কলিকাতা, বিষ্ণুপুর, ইউসুফপুর বা যশোর, লস্করপুর বা পুঠিয়া, মহম্মদ শাহী, ফতেহ সিং, ইদ্রাকপুর, ত্রিপুরা, পঞ্চকোট, জালালপুর, শেরপুর (পূর্ণি য়া), শেখের কুন্ডী (ঘোড়াঘাট), কাঁকজোল, তমলুক, শ্রীহট্ট, ইসলামাবাদ বা চট্টগ্রাম, চাক্লা বন্দর বালেশ্বর ও আসামের সীমানায় কারীবাড়ীর মধ্যে খন্তাঘাট, সায়রাত মহল এবং মজকুরী তালুক।

রাজশাহী নামকরণ কেমন করে হলো এর বিশেলষণ খুব একটা দূরচহ বা কষ্টসাধ্য নয়। এব্যাপারে যাঁরা ‘রাজা’ এবং ‘শাহী’ এই দুটো শব্দের সংযোগে রাজশাহী নামের উদ্ভব ঘটেছে বলে দাবী করছেন, তাদের সাথে আমি একমত। ‘রাজা’ শব্দটি সংস্কৃত এবং হিন্দী ভাষায় একই অর্থ বহন করে। ‘শাহ’ শব্দটি পারসী ভাষা থেকে এসেছে যেটি হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষার ‘রাজা’ শব্দটির সাথে একই অর্থ জ্ঞাপক। তবে শুধু রাজ শব্দটি কিন্তু আরবী ভাষায় মিস্ত্রী বা স্থপতিকে বুঝায় (Mason, Architect)। পারসী ভাষায় শুধু ‘রাজ’ বলতে বুঝায় গোপন বা রহস্যময় (Secret, Mystery)। হিন্দী এবং সংস্কৃত ভাষায় ‘রাজ’ এর সাথে অন্য শব্দ যুক্ত হলে বিভিন্ন অর্থ বহন করে যেমন, রাজবন্দী, রাজদরবার, রাজমহল, রাজসরকার, রাজকোষ, রাজভোগ, রাজবললব, রাজদ্রোহ, রাজপথ ইত্যাদি। শাহ বিশেষণ হলে হচ্ছে শাহী অর্থাৎ Kingly। আমরা সাধারণভাবে বলে থাকি নাটোররাজ, বৃটিশরাজ ইত্যাদি। এভাবেই রাজা থেকে রাজ এবং শাহ থেকে শাহী শব্দ দুটি একত্রিত হয়ে ‘রাজশাহী’ নামের উদ্ভব ঘটেছে। রাজশাহী অঞ্চলে বহু জমিদার এবং রাজাতুল্য জমিদারের বসবাস ছিল। পাল ও সেন রাজাদের রাজত্ব ছিল এই অঞ্চলে। পরবর্তীকালে শাহ সুলতানদের রাজত্ব এবং শাহ ফকির দরবেশগণের আগমন ঘটেছে রাজশাহীর মাটিতে ব্যাপকভাবে। একারণে রাজা এবং শাহ এই দুটি শব্দের সাথে ঐতিহাসিকভাবেই এলাকার যোগসূত্র রয়ে গেছে যুগ যুগ ধরে।

অনেকের মতে, সুবাদার মানসিংহ রাজমহলে (&আগমহল) বাংলার রাজধানী স্থাপন করেন। উদয় নারায়ণের (স্যার জন শোর ২ এপ্রিল ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের রিপোর্টে উদিত নারায়ণ বলে উলেলখ করেছেন) পরগনা যেটি প্রাচীন রাজশাহী নামে কথিত, এটি রাজমহলের পশ্চিমে পাকুড় নামক এলাকার কাছাকাছি অবস্থানে।

এই সূত্র ধরে ‘বাঙ্গলার ইতিহাস’ গ্রন্থের লেখক শ্রী কালীপ্রসন্ন শর্মা বলতে চেয়েছেন, রাজশাহী নামকরণটি মানসিংহের সময়ে হয়েছে এবং তার কর্ম কান্ডের মাধ্যমে। এই দাবীর পেছনে জোরালো যুক্তি নেই। অনেকেই মনে করেন রাজা গণেশ গৌড়ের সিংহাসন দখল করেছিলেন মুসলিম শাসকদের পরাজিত করে। তার পুত্র যদু যিনি জালাল উদ্দীন নামে খ্যাত- তিনিও বেশ কয়েক বছর সুনামের সাথে গৌড় রাজ্য শাসন করেছেন। এরা একাধারে ছিলেন রাজা এবং শাহ সুলতান। তাই এদের কারণেই ‘রাজশাহী’ নামকরণ। এই যুক্তিটিও দূর্ব ল। কারণ মানসিংহ কিংবা রাজা গণেশ এদের সময়ের কোন সরকারি নথিতে রাজশাহী নামের কোন উলেলখ নেই। নবাব মুর্শি দকুলী খানের সময়ে নতুন ভূমি রাজস্ব ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা প্রবর্তিত হলে সর্ব প্রথম বর্তমান রাজশাহী শব্দটির সাক্ষাত পাই রাজশাহী জমিদারী সৃষ্টির মাধ্যমে।

শহর হিসেবে রাজশাহী নামটি এসেছে সর্ব শেষে। এতোক্ষণ আমরা রাজশাহী জমিদারী বা প্রাশাসনিক ও রাজস্ব অঞ্চল নিয়ে আলোচনা করেছি। পরবর্তীকালে রাজশাহী জমিদারীর এলাকা বিচ্ছিন্ন হয়ে একাধিক জেলা গঠিত হয়। যেমন- রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, যশোর, কুষ্টিয়া ও ফরিদপুরের একাংশ, মালদহ, মুর্শি দাবাদ ও নদীয়ার একাংশ। বিভাগের নামটিও রাজশাহী। বর্তমান রাজশাহী শহরটির প্রাচীন নাম মহাকালগড়। রাজশাহী শহরের এখনকার এলাকা লস্করপুর, গড়েরহাট, তাহিরপুর, মোহাম্মদপুর, হিজরাপুর, তেগাছি ও খাসতালুক প্রভৃতি পরগনার অধীন ছিল। শহরের দরগাহ পাড়াসহ মাস্টারপাড়া, কলেজ, হোসেনীগঞ্জ এবং পাঠানপাড়ার একাংশ ‘মহাকালগড়’ নামে পরিচিত ছিল। যতদূর জানা যায় ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে মহাকালগড়ের আশেপাশে কোন জনবসতি গড়ে উঠেনি। পদ্মা থেকে উৎপত্তি লাভ করে কয়েকটি নদী এবং খাল দক্ষিণ থেকে উত্তরে প্রবাহিত হতো। তখনও মূল শহরটি পদ্মার পলাবনভূমি হিসেবেই ভূমি গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে আবর্তিত হচ্ছিল। এমনি একটি ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে হযরত তুরকান শাহ, শাহ মখদুম রূপোশ (রহ:)সহ বেশ কয়েকজন সূফি দরবেশগণের আগমন ঘটে এই জনপদে। মহাকালগড়ের দেব মন্দিরের সেবাইত এবং সামন্তরা নতুন আগত মানুষদের কাজে বাধা দেন। শেষে যুদ্ধ হলে সামন্তদের পরাজয় ঘটে। আগত দরবেশগণের সান্নিধ্যে মানুষ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। সুফি দরবেশগণ ধর্মে র বাণী প্রচারের পর পরলোকগমন করলে অগণিত ভক্ত মহাকালগড় নামক জনপদটির নতুন নামকরণ করলেন বুয়ালিয়া। পারসী ‘বু’ অর্থ সুবাস(Scent)। অর্থ াৎ আউলিয়াগনের সুবাসিত স্থান। চতুর্দ শ শতাব্দীর প্রথম দিক থেকে শুরচ করে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক অবধি শহরের নাম ছিল বুয়ালিয়া।

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দে যখন নাটোর থেকে জেলা সদর দপ্তর বুয়ালিয়াতে স্থানান্তরিত হয়েছিল, এরপর থেকেই শহরটির নতুন নাম হলো রামপুর বোয়ালিয়া। এর প্রধান কারণ হচ্ছে- এই শহরে শ্রীরামপুর নামে একটি মৌজা রয়েছে। এর সিংহভাগ পদ্মা গহবরে চলে গেছে ১৮৬৪ সালের বন্যায়।[৫৫] ১৮২৫ সালে কর্তৃপক্ষ শ্রীরামপুরে কালেক্টরেট, জজ আদালত সহ সরকারী বিভিন্ন দপ্তর নির্মাণ করেন। যেহেতু শহরের প্রায় সকল প্রশাসনিক কর্মকান্ড শ্রীরামপুর মৌজাকে কেন্দ্র করে হচ্ছিল, সে কারণে শহরের নাম বুয়ালিয়ার পূর্বে রামপুর যুক্ত হয়ে রামপুর বোয়ালিয়া এই নামেপ্রতিষ্ঠা পেল। শ্রীরামপুর বোয়ালিয়া নামটিও হতে পারতো। হয়তো উচ্চারণের সুবিধার্থে অতিরিক্ত শ্রী শব্দটি পরিহার করা হয়েছে। ১৮৬৪ সালের ভয়াবহ বন্যায় নবনির্মিত প্রশাসনিক সকল ভবন পদ্মার ভাঙ্গনে বিলীন হয়ে গেলে ১৮৬৪ থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে বুলনপুরের বর্তমান স্থানে প্রশাসনিক দপ্তরের ভবনসমূহ নতুন করে নির্মিতহয়েছে। শ্রীরামপুর মৌজার প্রায় পঁচাত্তর ভাগ পদ্মায় চলে গেছে। অবশিষ্টাংশ বর্তমানের খ্রিস্টান মিশন হাসপাতাল, গীর্জা, মোটেল, শহীদ কামারচজ্জামান পার্ক, টেনিস কমপেলক্স, বোয়ালিয়া ক্লাবের এলাকাসমূহ রয়ে গেছে।

১৮২৫ খ্রিস্টাব্দের পর শহরটি রামপুর বোয়ালিয়া নামে পরিচিতি পেতে থাকে। তবে ১৮২৫ সালের ঠিক পরে পরেই রামপুর বোয়ালিয়া নামটি সরকারিভাবে প্রতিফলিত হয়নি। ১৮২৮ সালে শহরে প্রথম ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় যার নামকরণ করা হয়েছে ‘বাউলিয়া ইংলিশ স্কুল’। হতে পারতো ‘রামপুর বাউলিয়া ইংলিশ স্কুল’। সেটি কিন্তু হয়নি। ১৮৫৩ সালের পূর্বে সরকারিভাবে যে সকল মানচিত্র প্রকাশিত হয়েছিল তাতে রামপুর নামের কোন উলেলখ নেই। ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দে সরকারিভাবে বেঙ্গাল প্রেসিডেন্সির মানচিত্র প্রকাশিত হয়। সেখানে পদ্মাতীরবর্তী বোয়ালিয়া নামের শহরটি নির্দিষ্ট করে দেখান আছে। রামপুর বোয়ালিয়া নামটি তখনও সরকারিভাবে ব্যবহৃত হয়নি। ১৮৫৩ সালের প্রস্তুতকৃত বেঙ্গাল প্রেসিডেন্সির মানচিত্রে সর্ব প্রথম লক্ষ্য করা গেল রামপুর বোয়ালিয়া নামটি।১৮৫৮ সালে আরও একটি মানচিত্র প্রকাশিত হয়। এই মানচিত্রে শুধু রামপুর নামটি রয়েছে। বোয়ালিয়া বা বুয়ালিয়া নাম নেই।

১৬৬০ সালে চুঁচুড়ার ডাচ গভর্ন র ভ্যান ডেন ব্রক বাংলার একটি নক্সা বা মানচিত্র এঁকেছিলেন। সেখানে কাশিমবাজার থেকে বোয়ালিয়া হয়ে বগুড়া এবং আসাম অবধি একটি শাহী পথের নির্দে শ রয়েছে। উক্ত মানচিত্রে বোয়ালিয়ার অবস্থান দেখান হয়েছে। যদিও বোয়ালিয়া শব্দের বানানে অসামঞ্জস্য লক্ষণীয়। এর পরেও সেটিই যে বোয়ালিয়া এতে সন্দেহের অবকাশ অতি সামান্যই। ১৭৭৬ সালে মেজর জেমস রেনেল বাংলার মানচিত্র প্রস্তুত করেন। সেখানে তিনি মূখ্যত বিভিন্ন নদ-নদীর গতিপথ

নির্দি ষ্ট করে দেখানোর প্রয়াসী হয়েছেন। এই মানচিত্রে গঙ্গা তীরবর্তী বুয়ালিয়া শহরটিস্পষ্টভাবে উলেলখ করা হয়েছে। সেখানে রামপুর বোয়ালিয়ার কোন অস্তিত্ব নেই।

এরপরের আলোচনা হচ্ছে শহরে রামপুর এবং বোয়ালিয়া বলতে ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্য ন্ত যে সকল এলাকা বোঝান হতো, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এসে ভিন্ন মহললাকে রামপুর এবং বোয়ালিয়া নামে আখ্যা দেয়া হল। বর্তমান দরগাহ পাড়া এবং তৎসন্নিহিত এলাকাকে প্রাথমিকভাবে বুয়ালিয়া (সে সময়কার সম্পূর্ণ শহর এলাকা) নামে আখ্যায়িত হত। শ্রীরামপুর মৌজার অবস্থান হচ্ছে বর্তমান খ্রিস্টান গির্জাসহ দক্ষিণের সমূদয় অংশ। ১৮৭৬ সালে রামপুর বোয়ালিয়া মিউনিসিপ্যালিটির প্রতিষ্ঠাকাল। যদিও কিছু প্রামাণিক তথ্য বলছে, ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে মিউনিসিপ্যালিটি প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলো। প্রথমাবস্থায় মোট ৭টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল এই শহরটি। সে সময়কার শহর পরিকল্পনাবিদগণ খুব সম্ভবত ওয়ার্ড সমূহের নামের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।'রামপুর বাজার' নামক মহললাটি এসে গেছে ঘোড়ামারা বাজারের উত্তরাংশসহ সামান্য কয়েকটি বাড়িঘর এবং দোকান পাট নিয়ে। পোস্ট অফিসসহ সন্নিহিত পূর্ব দিকের এবং উত্তর দক্ষিণের কিছু বাড়ীঘর নিয়ে ঘোড়ামারা মহললা। এটি বর্তমান কালের ওয়ার্ড নং২২ এর অধীন। বোয়ালিয়া পূর্বে র বুয়ালিয়ার স্থানে নেই। এটি রেশমপট্টি (তাঁতী পাড়া) সন্নিহিত উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশের মহললাকে নির্দি ষ্ট করা হয়েছে। বোয়ালিয়া নামক মহললাটি বেশ বড়। আমরা যে পাড়াগুলিকে রেশমপট্টি, মুন্সিডাঙ্গা ইত্যাদি নামে অভিহিত করছি এগুলির সরকারি নাম বোয়ালিয়া। বর্তমান রাণীবাজার বালিকা বিদ্যালয়, স্যার যদুনাথ সরকারের বাড়ী, পার্শ্ববর্তী দক্ষিণদিকের মসজিদ এগুলি সবকিছুই বোয়ালিয়া মহললার অন্তর্ভূ ক্ত। এটি ওয়ার্ড নং২০ এর অধীন।

রামপুর বোয়ালিয়া নামটি ১৯৪৭ সাল অবধি সরকারিভাবে প্রচলিত ছিল। শহর হিসেবে রাজশাহী নামটি প্রথম লক্ষ্য করা গেছে রেলস্টেশনের নামকরণের মধ্য দিয়ে। ১৯২৯ সালে রেলস্টেশন চা হলে এর নাম ছিল রামপুর বোয়ালিয়া। সামান্য কিছুদিন পরেই নাম বদলে রাজসাহী রাখা হয়। এরপর ১৯৪৭ সালে বৃটিশদের কবল থেকে দেশ মুক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টির পর স্টেশনের নাম হয় রাজশাহী। এর পূর্বে পোস্টাল ডিপার্ট মেন্ট রামপুর বোয়ালিয়ার পরিবর্তে শহরকে রাজশাহী নামে অভিহিত করেছেন। ১৯৪৭ সালের পর থেকে শহরটি রাজশাহী নামে পরিচিত।

কৃতজ্ঞতায়
মাহবুব সিদ্দিকী
লেখক ও গবেষক